হাতে-কলমে
ইলেকট্রনিক্স
রত্নেশ্বর রায়

হাতে-কলমে ইলেকট্রনিক্স

২৯টি প্রজেক্টসহ ইলেকট্রনিক্স শিক্ষার বই

রত্নেশ্বর রায় এম. টেক.

সিনিয়র ইঞ্জিনীয়ার
সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স

গেস্ট লেকচারার
ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ
৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

বাবা ও মা-কে

ভূমিকা

নির্দ্ধিধায় বলা যায়, ইলেকট্রনিকস্ই আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখা। টেলিভিসন, কমপিউটার, রোবট বা যন্ত্রমানব – এসব বিস্ময়কর উদ্ভাবন ইলেকট্রনিকসেরই অবদান। বর্তমানে ইলেকট্রনিকস্-এর যে বিপুল উন্নতি ঘটেছে তার সব কিছু আয়ত্ত করে নেওয়া বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়—এজন্য চাই দীর্ঘ দিনের একনিষ্ঠ অনুশীলন। কিন্তু ইলেকট্রনিকস্-এর প্রাথমিক বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচয় করে নেওয়া আদৌ শক্ত ব্যাপার নয়। কিছু সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে যে কেউ বাড়িতে বসেই ইলেকট্রনিকস্-এর অনেক মজাদার এবং চমকপ্রদ সার্কিট তৈরি করে তাদের ক্রিয়া কৌশল প্রত্যক্ষ করতে পারে। বড়ো মাপের কোন ইলেকট্রনিকস্ যন্ত্রও গড়ে ওঠে ছোট ছোট কতকগুলো প্রাথমিক সার্কিটের সমাবেশে। আর, সে সব প্রাথমিক সার্কিটগুলোর কার্যপদ্ধতি যে কেউ হাতে-কলমে আয়ত্ত করে নিতে পারে বাড়িতে বসেই। এর ফলে সহজেই তারা জটিলতর ইলেকট্রনিকস্ যন্ত্রপাতির কার্যপদ্ধতিও অনুধাবন করতে পারবে। ঐ সব ছোটখাটো সার্কিটের সঙ্গে পরিচিত হলে তারা যে কেবল ইলেকট্রনিকস্ সম্পর্কে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাই লাভ করবে তা নয়, ইলেকট্রনিকসের বিস্ময়কর জগৎটিও তাদের চোখে ধরা দেবে।

সঙ্গত কারণেই ইলেকট্রনিকস্ সম্পর্কে সাধারণের কৌতূহল বেড়েছে। বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা এখন নানান ধরনের ইলেকট্রনিকস্-নির্ভর প্রজেক্ট করছে—জেলা স্তরে এবং রাজ্য স্তরে নানান বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছে। তবে দেখা যাচ্ছে, এসব প্রজেক্ট বহু ক্ষেত্রেই গতানুগতিক। যারা এসব প্রজেক্ট করে প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে তারাও অনেক ক্ষেত্রে তাদের তৈরি সার্কিটের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিতে পারে না। ইলেকট্রনিকস্-এ হাতে-কলমে কাজ করার সঠিক পথ-নির্দেশ সংবলিত বই-এর অভাবই ছাত্রছাত্রীদের এ অক্ষমতার অন্যতম কারণ।

পেশাগত জীবনে ইলেকট্রনিকস্-এর সঙ্গে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়েছে যে, ইলেকট্রনিকস্ এর ছোট ছোট কিছু সার্কিটের সঙ্গে তাদের সম্যক পরিচিতি ঘটিয়ে দিতে পারলে তারা আরও সুষ্ঠুভাবে তাদের প্রজেক্ট শেষ করতে পারবে এবং সেগুলোর কার্যনীতির ব্যাখ্যা করতে পারবে। এ উদ্দেশ্যেই 'হাতে-কলমে ইলেকট্রনিক্স' বইটি রচিত হয়েছে। এ উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর সফল হয়েছি সে বিচার পাঠকদের।

বইটির উৎকর্ষ সাধনে কোন পরামর্শ বা সুচিন্তিত মতামত পেলে বাধিত হব।

রত্নেশ্বর রায়

সাহা ইনস্টিটিউট
৯২, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইলেকট্রনিক্স কী

আমরা জানি বিশ্বের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি হয়েছে কয়েকটি মাত্র মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে। এই মৌলিক পদার্থগুলো আবার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণার সমষ্টি মাত্র। মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম রূপকে বলা হয় পরমাণু। এই পরমাণুগুলো আবার গড়ে উঠেছে কয়েকটি মৌলিক কণার সমন্বয়ে—যেমন প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন প্রভৃতি। এদের মধ্যে প্রোটন হ'ল ধনাত্মক তড়িৎধর্মী এবং ভারি। এর অবস্থান পরমাণুর কেন্দ্রে। ইলেকট্রন হচ্ছে, সমপরিমাণ কিন্তু ঋণাত্মক তড়িৎধর্মী এবং হাল্কা। এরা প্রোটনের চারপাশে কয়েকটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে অবিরাম ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর নিউট্রন হ'ল তড়িৎ নিরপেক্ষ কিন্তু প্রোটনের সঙ্গে প্রায় সম ওজনের। এরা প্রোটনের সাথে জড়াজড়ি করে পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থিত। যদিও ইলেকট্রনগুলো প্রোটনের টানে আটকা থেকে কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এদেরকে কক্ষচ্যুত করাও সম্ভব।

এই অতি ক্ষুদ্র ও হাল্কা ইলেকট্রন নামক ঋণাত্মক তড়িৎধর্মী মৌলিক কণার সমষ্টির প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে বহু বিস্ময়কর কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতির মূলে রয়েছে, এই ইলেকট্রনের প্রবাহ—কখনও সে প্রবাহ বস্তুর মধ্যে আবার কখনও বা বায়ুশূন্য স্থানে অর্থাৎ ভ্যাকুয়ামে। ইলেকট্রনের উৎপত্তি থেকে শুরু করে তাকে বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য নানা কৌশলের প্রয়োগ পদ্ধতি, এবং উন্নত ধারণা ও জ্ঞানলাভের জন্য সুসংহত বিচার ও বিশ্লেষণকে আমরা এককথায় ইলেকট্রনিক্স বলতে পারি।

উপকরণ

যদিও ইলেকট্রনিক্সের মূল কথা ইলেকট্রন, এদের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও যথাযথ প্রয়োগ পদ্ধতির পেছনে রয়েছে বেশ কয়েকটি উপকরণ। ইলেকট্রনিক্স সংক্রান্ত কোন কাজ করতে হলে এই উপকরণ (component) গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই ছোট খাট উপকরণগুলো যেন ভাষার বর্ণের মত যাদের সফল সংযোগে গড়ে উঠেছে নানা ধরনের বিস্ময়কর সার্কিট (circuit) অথবা সিস্টেম (system)। এই সার্কিট কখনও ছোট ও সহজ আবার কখনও এরা বড় এবং জটিল। তবে যতই বড় অথবা জটিল হোক, পরিষ্কার ধারণাকে কাজে লাগিয়ে বহু জটিল সার্কিটকেও বোঝা সহজ। তাই আসল কথা ছোট থেকে শুরু।

তাই আসুন, ছোট থেকে শুরু করি। আর এই ছোট বলতে বুঝি ছোট খাট উপকরণ।

উপকরণগুলি কোন সার্কিটে প্রয়োগের বেলায় বিশেষ বিশেষ উপকরণকে বিশেষ বিশেষ চিহ্ন দ্বারা বোঝান হয়ে থাকে। এই চিহ্নের সঙ্গে পরিচিত না হলে কোন ইলেকট্রনিক সার্কিট বোঝা অসম্ভব না হলেও খুব কঠিন। তাই সার্কিটকে বুঝতে পারা সহজ করার জন্য প্রত্যেকটি উপকরণকে নির্দিষ্ট চিহ্ন দ্বারা বোঝান হয়। এরকম প্রধান কয়েকটি উপকরণের নাম ও চিহ্নের সচিত্র তালিকা নিচে দেওয়া হল।

উপকরণের নাম	চিহ্ন	উপকরণের নাম	চিহ্ন
রেজিষ্টর (রোধ)		ট্রানজিষ্টর (NPN)	
ভ্যারিয়েবল রেজিষ্টর		ট্রানজিষ্টর (PNP)	
লাইট ডিপেণ্ডেন্ট রেজিষ্টর (LDR)		ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিষ্টর (FET)	
থার্মিষ্টর		ইউনিজাংশান ট্রানজিষ্টর (UJT)	
ইনডাকটর (কুণ্ডলী)		ফোটো-ট্রানজিষ্টর	
ক্যাপাসিটর		মেটাল অক্সাইড FET	
ভ্যারিয়েবল ক্যাপাসিটর		সিলিকন কনট্রোলড সুইচ (SCS)	
ডায়োড		সিলিকন কনট্রোলড রেকটিফায়ার (SCR)	
ফোটো ডায়োড		সিলিকন ইউনিল্যাটারাল সুইচ (SUS)	
লাইট এমিটিং ডায়োড (LED)		সিলিকন বাইল্যাটারাল সুইচ (SBS)	
জেনার ডায়োড		ডায়াক	
ভ্যারাক্টর ডায়োড		ট্রায়াক	

উপকরণের চিহ্ন

বলা বাহুল্য উপকরণের এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়। নিত্য নূতন উপকরণ আবিষ্কারের ফলে কোন তালিকাই শেষ তালিকা বলে দাবি করা অযৌক্তিক ও অসম্ভব।

এই তালিকা থেকে দেখে নিলাম কোন্ উপকরণের জন্য কেমন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু নাম ও চিহ্নের সাথে পরিচিত হলেই কাজ মিটে যাবে না। উপকরণটি আসলে দেখতে কেমন তারও ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। হামেশাই ব্যবহার করা হয় এমন কতকগুলো উপকরণ সম্পর্কে ধারণার সুবিধের জন্য তাদের কয়েকটি ছবি জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। নাম, চিহ্ন ও আকারের ধারণা হলে কাজ করা অনেক সহজ হবে। এবারে দেখা যাক্ কোন্ জিনিসের কী কাজ কেমন করেই বা সেগুলো তৈরি করা হয়।

রেজিস্টর বা রোধ ঃ সরু নাইক্রোম তার বা কার্বনের সাহায্যে সাধারণতঃ রোধ তৈরি করা হয়ে থাকে। যে কোন সার্কিটে এই রোধ বিদ্যুতের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

রোধ যত বেশী হয়, একটি নির্দিষ্ট বিভব মাত্রায় বিদ্যুৎপ্রবাহ তত কম হয়। এর একক হল ওহ্‌ম (Ω)। এক হাজার ওহ্‌মকে এক কিলো ওহ্‌ম (kΩ) বলা হয়। আবার দশ লক্ষ ওহ্‌মকে সংক্ষেপে বলা হয় এক মেগ ওহ্‌ম (MΩ)।

রোধ

আলোক নির্ভর রোধ (Light dependent resistor LDR)ঃ এটি সাধারণতঃ ক্যাডমিয়াম সালফাইড নামক একপ্রকার রাসায়নিক যৌগ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। অন্ধকারে এর রোধ আলো পড়লে এর রোধ খুব কমে অনেক বেশী, কিন্তু এর উপরে যায়। আলোর অস্তিত্ব ও মাত্রা বুঝবার জন্য LDRকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

তাপ নির্ভর রোধ (Thermistor) ঃ নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, কোবাল্ট ও লোহা প্রভৃতি কয়েকটি ধাতুর অক্সিজেন ঘটিত যৌগের (oxide) একটি বিশেষ ধর্মকে কাজে লাগিয়ে এই উপকরণটি তৈরি করা হয়। তাপের প্রভাবে এই যৌগের রোধ খুব কমে যায়। এই ধর্মকে বলা হয় নেগেটিভ টেম্পারেচার কোইফিসিয়েন্ট (negative temp. co-efficient NTC)। অবশ্য কিছু কিছু থার্মিস্টর তৈরির ক্ষেত্রে এমন যৌগ ব্যবহার করা হয়, তাপমাত্রা বাড়ালে যাদের রোধ বেড়ে যায়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর থার্মিস্টরগুলোকে সাধারণভাবে বলা হয় পিটিসি থার্মিস্টর (PTC—Positive temp. co-efficient)।

কুন্ডলী (Coil)ঃ লাটাইতে যেমন সুতো জড়ান হয়, অন্তরক আস্তরণযুক্ত পরিবাহী তারকে কোন ইনস্যুলেটর বা ফেরাইট কোরের উপর তেমন করে জড়িয়ে নিলে যে জিনিসটি তৈরি হয় তাকে বলা হয় ইনডাকটর বা কয়েল। সাধারণতঃ কোন চৌম্বক পদার্থকে এর কোর হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইনডাকটরের বিশেষ ধর্ম হ'ল পরিবর্তনশীল তড়িৎ প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করা।
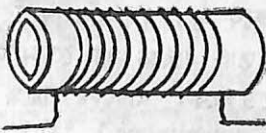
কুণ্ডলী

ধারক (Capacitor)ঃ যে কোন ধাতুর দুটি পাতকে আলাদাভাবে একটি

অন্যটির সমান্তরালভাবে রেখে দুটি ধাতব তারের সাহায্যে পাত দুটিকে যুক্ত করে নিলে যেটি তৈরি হ'ল তাকে বলা হয় ধারক বা ক্যাপাসিটর (capacitor)। দুটি পাতের বদলে অনেকগুলো পাতের ব্যবহার করে অনেক বড় মাপের ধারক তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রেও অর্দ্ধেক পাতকে একটি তার দিয়ে এবং বাকি অর্দ্ধেক পাতকে অন্য একটি তার দিয়ে যুক্তকরা হয়ে থাকে। অনেকগুলি পাতকে এমনি করে ব্যবহারের সুবিধে হ'ল— এতে ধারকটির ধারণ ক্ষমতা (capacity) অনেক বেড়ে যায়। ধারণ ক্ষমতা মাপার একক হ'ল—ফ্যারাড (farad)। যেহেতু এই একক অনেক বড়, এর দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগকে মাইক্রোফ্যারাড্ (microfarad) বলে। কোন তড়িৎ উৎসের সাথে একটি ধারককে জুড়ে দিলে ধারকটি চার্জ নিতে থাকে এবং এই চার্জ সংগ্রহের সাথে সাথে ধারকটির দুইপ্রান্তের বিভবমাত্রাও বাড়তে থাকবে। কোন জলের পাত্রে জল ঢাললে যেমন করে জলতলের উচ্চতা বাড়তে থাকে, বিভব বাড়ার ব্যাপারটিও প্রায় সে রকম। আবার কোন এসি ভোল্টেজের দুটি প্রান্তের মধ্যে একটি ধারক বসালে এসি বিদ্যুৎপ্রবাহে ওই ধারকটি একটি বিশেষ মানের রোধ সৃষ্টি করবে। এই রোধের মান নির্ভর করবে এসি বিদ্যুতের কম্পাঙ্ক (frequency) এবং ধারকটির ধারণ ক্ষমতারউপর। এই দুটি সংখ্যা যত বাড়বে রোধের মান ব্যাস্তানুপাতে তত কমবে।
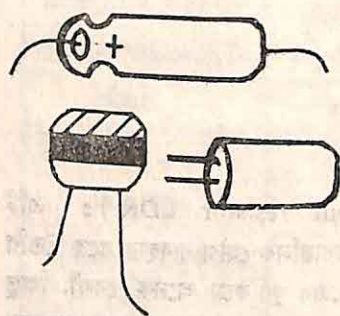
ধারক

রোধ, ইনডাকট্যান্স্ বা ধারক ব্যবহারের আগে এদের বিষয়ে আরও কিছু কথা জানতে হবে। রোধের মান, রোধের বিদ্যুৎ পরিবহণ ক্ষমতা, বিভব সহ্যের মাত্রা, তাপ বিকিরণ সীমা না জানা থাকলে কোন রোধকে নিশ্চিত মনে কোন সার্কিটে ব্যাবহার করা সম্ভব নয়, তাই রোধের মান (Ω) ; তাপবিকিরণ ক্ষমতা (ওয়াট) এবং ভোল্টেজ রেটিং জানা থাকা চাই। সাধারণ সার্কিটের ক্ষেত্রে এক চতুর্থাংশ ওয়াট ($\frac{1}{4}$w) থেকে শুরু করে এক ওয়াট (1w) পর্যন্ত রোধ ব্যবহারের চল বেশী। সব ক্ষেত্রেই ভোল্টেজ রেটিং হল 220 volt।

ইনডাকৃট্যান্স ব্যবহারের সময় শুধু ইনডাকৃট্যান্স এর পরিমাণ (যা হেনরি অথবা মিলি হেনরি বা মাইক্রো হেনরি দ্বারা বোঝান হয়) জানলেই হবে না। যে পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহ ওই ইনডাকৃট্যান্স এর ভিতর দিয়ে হতে পারে তার সর্বোচ্চ মাত্রা জেনে নিয়ে তারের গেজ (মোটা সরু মাপার একক) ঠিক করে নিতে হবে। ধারকের সম্বন্ধে যে তিনটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় তা হল—ধারণ ক্ষমতা, (capacitance), বিভব মাত্রা সহ্য করার স্বাভাবিক মাত্রা (working voltage) এবং সর্বোচ্চ মাত্রা (peak voltage rating)। এছাড়া electrolytic capacitors ব্যবহার করলে ধারকের টার্মিনাল

দুটিকে চিনতে হবে। এর একটিকে ধনাত্মক বিভবের সাথে অন্যটিকে ঋণাত্মক বিভবের সাথে যুক্ত করতে হবে। ভুল ক্রমে উল্টো সংযোগ হলে capacitorটি ফেটে বিপদ ঘটাবে। Electrolytic capacitor এর capacitance এর মান সাধারণ ভাবে অনেক বেশী হয় কিন্তু এদের বিভব মাত্রা কয়েকশ ভোল্টের মধ্যে সীমিত থাকে। সাধারণ কাজের জন্য এটির বহুল ব্যবহার আছে। অন্য যে সকল capacitor বাজারে হামেশাই দেখা যায় তাদের মধ্যে paper capacitor, mica capacitor, air capacitor ইত্যাদি প্রধান। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ট্যাণ্টালাম capacitor ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এখানে একটি কথা বলে রাখি, কখনও উচ্চ capacitance মানের কোন condenser কে বিদ্যুৎ উৎসের সাথে যোগ করলে ঐ ধারকটিকে তড়িৎ আধান জমা হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ উৎস থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও অনেকক্ষণ যাবৎ ঐ ধারকে আধান উপস্থিত থাকে। তাই ওই ধারককে কখনও সঙ্গে সঙ্গে ছুঁলে শক খাবার সম্ভাবনা থাকবে। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করার পর একটি অন্তরিত হাতল যুক্ত ধাতব দণ্ডের সাহায্যে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক টার্মিনাল দুটিকে এক সাথে যুক্ত করতে হবে। সশব্দে বিদ্যুৎ বিমোচন হয়ে ধারক তখন বিদ্যুৎমুক্ত হবে।

ট্রান্সফর্মার (Transformer) ঃ ইলেক্ট্রনিক্স এর কাজ করতে গেলে ট্রান্সফর্মারকে চিনে ও বুঝে নিতেই হবে। এটি তৈরি করা হয় লোহা, ষ্টীল বা ফেরাইট কোরের উপর তামা বা অ্যালুমিনিয়াম তারের কুণ্ডলী পাকিয়ে। নানা রকমের কাজে ট্রান্সফর্মার এর ব্যবহার থাকায় এর প্রকার ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। রাস্তার ধারে আমরা অনেকেই বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সাথে লাগান অনেক বড় ট্রান্সফর্মার দেখে থাকব। কিন্তু আমরা আমাদের এখানে যে ট্রান্সফর্মার-এর ব্যবহার দেখব সেগুলো এতই ছোট যে পকেটে নিয়ে ঘোরা যাবে।

ট্রান্সফর্মার

একটি ট্রান্সফর্মার-এ কমপক্ষে দুটো কুণ্ডলী থাকবে যার একটিকে প্রাইমারী (primary winding) এবং অপরটিকে সেকেণ্ডারি (secondary winding) বলা হয়। কখনও কখনও সেকেণ্ডারিতে একাধিক কুণ্ডলী থাকতে পারে।

যদি প্রাইমারী কুণ্ডলীতে ব্যবহৃত ভোল্টেজকে কমাবার প্রয়োজন হয় তবে সেকেণ্ডারি কুণ্ডলীর তারের পাক সংখ্যা আনুপাতিক হারে কম হয় এবং ট্রান্সফর্মারটিকে ষ্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার বলা হয়। পক্ষান্তরে কখনও সেকেণ্ডারিতে প্রাইমারি ভোল্টেজের তুলনায় বেশী ভোল্টেজ পাবার দরকার হলে আনুপাতিক হারে সেকেণ্ডারির পাক সংখ্যা বাড়াতে
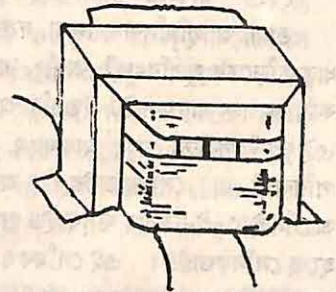
হবে এবং ট্রান্সফর্মারটিকে তখন ষ্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার (step up transformer) বলা হবে।

আমাদের কাজের জন্য আমরা সাধারণত ষ্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করব। এর সেকেণ্ডারিতে 3V, 6V, 9V, 12V, ইত্যাদির এক বা একাধিক ভোল্টেজ পাবার ব্যবস্থা থাকবে। বলা বাহুল্য একাধিক ভোল্টেজ পাবার জন্য বিভিন্ন ট্যাপ (tap) এর ব্যবস্থা থাকে (ছবি দ্রষ্টব্য)।

15V
12V
9V
6V
3V
0V
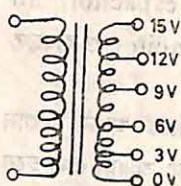
ট্রান্সফর্মার কুণ্ডলী

ট্রান্সফর্মার প্রসঙ্গে একটি অতিপ্রয়োজনীয় কথা বলে রাখছি। কখনও ভুলে গেলে চলবে না এটি শুধু **এসি ভোল্টেজের** সাথে লাগান যাবে। ভুল করে কেউ এটিকে ডিসি ভোল্টেজের সাথে জুড়ে দিলে এটি পুড়ে গিয়ে কেলেঙ্কারি ঘটিয়ে ছাড়বে।

সেমিকণ্ডাক্টর ঃ আমাদের অনেকেই এই শব্দটির সাথে পরিচিত। কেউ কেউ হয়ত সেমিকণ্ডাক্টর সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে জানি, আবার অনেকেরই ধারণা তেমন স্পষ্ট নাও হতে পারে। তাই সংক্ষেপে এর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক্।

আমরা জানি তড়িৎ পরিবহণ ক্ষমতার বিচারে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে তিনটি মূল ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) তড়িৎ পরিবাহী (conductor)
(খ) তড়িৎ অপরিবাহী (insulator)
(গ) মাঝারি পরিবাহী (semiconductor)

তামা, অ্যালুমিনিয়াম, সিসা, দস্তা, লোহা, পারদ এবং আরও অনেক ধাতু বা সঙ্কর ধাতু তড়িতের সুপরিবাহী অর্থাৎ এরা হল কণ্ডাক্টর। রবার, পলিথিন, নাইলন, কাচ, কাঠ, কাগজ, ব্যাকেলাইট ইত্যাদি অধাতু হল তড়িতের কুপরিবাহী বা ইনসুলেটর। আর এই দুই বিপরীত মেরুর মাঝখানে কয়েকটি পদার্থ রয়েছে, যারা বিদ্যুতের আংশিক পরিবাহী বা সেমিকণ্ডাক্টর। জার্মেনিয়াম, সিলিকন্, সেলিনিয়াম, গ্যালিয়াম আর্সেনাইড, ইনডিয়াম ফস্ফাইড প্রভৃতির মত কিছু কিছু মৌলিক, এবং যৌগিক পদার্থ হচ্ছে সেমিকণ্ডাক্টর। এই সেমিকণ্ডাক্টর সম্পর্কে একটু পরিষ্কার ধারণার জন্য যে কোন বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণুর গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে দু এক কথা বলে নিতে হবে।

পরমাণুর গঠন ঃ মৌলিক বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ হ'ল পরমাণু। পরমাণুকেও ভেঙে ফেলা যায় কিন্তু সেক্ষেত্রে বস্তুর পরিচয় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই পরমাণুর গঠন অনেকটা আমাদের সৌর জগতের গঠনের মত। পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে ধনাত্মক তড়িৎ ধর্মী প্রোটন। প্রোটনের চার পাশে রয়েছে ঋণাত্মক তড়িৎ ধর্মী ইলেকট্রন। সূর্যের চারদিকে যেমন করে বুধ, শুক্র, পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহগুলো অবিরাম ঘুরে বেড়ায়, প্রোটনের চারদিকে ইলেকট্রন কণাগুলোও তেমনি নির্দিষ্ট কক্ষপথে অবিরাম ঘুরে চলেছে। এ ছাড়া রয়েছে নিউট্রন নামে এক ধরনের তড়িৎ নিরপেক্ষ (neutral) কণা যারা প্রোটনের

সাথে জড়াজড়ি করে পরমাণুর কেন্দ্রে বাস করে। অবশ্য নিউট্রন নেই এমন বস্তুও রয়েছে, যেমন হাইড্রোজেন। স্বাভাবিক অবস্থায় একটি পরমাণুর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িতের পরিমাণ সমান। পরমাণুর এই গঠন প্রকৃতি নীচের ছবিটি থেকে সহজেই বুঝতে পারা যাবে।

এবারে দেখা যাক বিদ্যুৎ পরিবহনের ব্যাপারে পরমাণুর এই গঠন কেমন করে সাহায্য করে অথবা বাধা দেয়। বিদ্যুৎ হ'ল ইলেকট্রনের প্রবাহ। যেহেতু ইলেকট্রনের তুলনায় প্রোটন অনেকগুণ ভারি, এরা সহজে নড়াচড়া করে না। অনেক সহজেই ইলেকট্রনগুলো বস্তুর ভেতরে চলাফেরা করতে পারে। বিশেষ করে পরমাণুর কেন্দ্র থেকে দূরের কক্ষে অবস্থিত ইলেকট্রনগুলো অনেক বেশী সহজে যাতায়াত করতে পারে। এর কারণ হ'ল এদের উপর কেন্দ্রস্থ প্রোটনের প্রভাব এবং অনুশাসন তুলনামূলক ভাবে কম। এ ছাড়া আবার আরও একটি ব্যাপার রয়েছে। কেন্দ্র থেকে দূরে যাবার পথে প্রথম কক্ষে দুইটি ইলেক্ট্রন, দ্বিতীয় কক্ষে আটটি ইলেক্ট্রন, তৃতীয় কক্ষে আঠারোটি ইলেকট্রন, চতুর্থ কক্ষে বত্রিশটি ইলেক্ট্রন থাকার ব্যবস্থা আছে। [সাধারণ সূত্র—ইলেক্ট্রন সংখ্যা $= 2 \times$ (কক্ষের ক্রমিক সংখ্যা)^2] যে কোন একটি কক্ষে ইলেক্ট্রনের সংখ্যা এই সংখ্যার কম থাকতে পারে, কিন্তু বেশী থাকতে পারে না। কোন পরমাণুর বেলায় যদি দেখা যায় একেবারে শেষের কক্ষটিতে সর্বোচ্চ যত ইলেক্ট্রন থাকার সুযোগ আছে ততগুলো ইলেক্ট্রন রয়েছে সে ক্ষেত্রে পরমাণুটি কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশ নিতে অনিচ্ছুক হবে। এমন পরমাণুগুলোকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় পরমাণু যেমন নিয়ন। নিয়নের পরমাণুর কেন্দ্রে দশটি প্রোটন আছে। প্রথম কক্ষে আছে দুইটি ইলেক্ট্রন, দ্বিতীয় কক্ষে আছে আটটি ইলেক্ট্রন। এই ধরণের পরমাণুগঠন প্রকৃতি সম্পন্নবস্তুরা বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা রহিত অর্থাৎ ইনসুলেটর। এর কারণ হল এর ইলেক্ট্রনগুলোকে সহজে কক্ষচ্যুত করা যায় না।
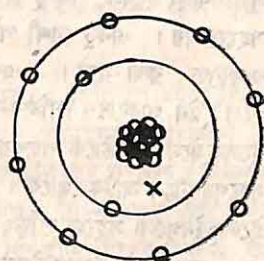
পরমাণুর গঠন

এবারে যদি আমরা তামার পরমাণুর দিকে তাকাই তাহলে কী দেখব। পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে, ঊনত্রিশটি প্রোটন। স্বাভাবিক অবস্থায় ইলেক্ট্রনের সংখ্যাও হবে ঊনত্রিশ। এই ঊনত্রিশটি ইলেক্ট্রন রয়েছে—প্রথম কক্ষে দুইটি, দ্বিতীয় কক্ষে আটটি তৃতীয় কক্ষে আঠারোটি, এবং চতুর্থ কক্ষে একটি। দেখা যাচ্ছে চতুর্থ কক্ষে বত্রিশটি ইলেক্ট্রনের থাকার জায়গা থাকা সত্ত্বেও মাত্র একটি ইলেক্ট্রন রয়েছে। এই ইলেক্ট্রনটি অসম্পূর্ণ কক্ষে থাকার ফলে রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশ নিতে তামা বেশ উৎসাহী হবে। এছাড়া শেষের ইলেক্ট্রনটিকে সামান্য মাত্র ইলেক্ট্রিক ফিল্ডের প্রভাবে কক্ষচ্যুত করা সম্ভব। এমন কি তাপীয় শক্তির প্রভাবেও ইলেক্ট্রনটি কক্ষ থেকে বেড়িয়ে এদিক ওদিক ঘুরে

বেড়াতে পারবে। এই ধরণের ইলেক্ট্রনের সাহায্যে বিদ্যুৎ পরিবহন সহজ হয় বলে তামাকে বিদ্যুতের পরিবাহী বলা হয়।

এবারে দেখা যাক্ কারা সেমিকণ্ডাক্টর এবং কেমন তাদের পরমাণুর চেহারা। সিলিকন এবং জার্মেনিয়াম নামক দুটি মৌলের পরমাণু কেন্দ্রে রয়েছে, যথাক্রমে চৌদ্দটি এবং বত্রিশটি প্রোটন। প্রথমটির বেলায় ইলেক্ট্রন বিন্যাস হ'ল—2, 8, 4 এবং দ্বিতীয়টির বেলায় এই বিন্যাস হচ্ছে 2, 8, 18, 4। দেখা যাচ্ছে শেষের কক্ষটি উভয় ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ। অতএব আশা করা স্বাভাবিক এরাও তামার মতই বিদ্যুতের সুপরিবাহী হবে। কিন্তু অবস্থাটা হ্যাঁ এবং না এর মাঝামাঝি। অর্থাৎ পরিবাহী, কিন্তু সহজে নয়। একটু বেশী পরিমাণ শক্তি ব্যয় করলে তবেই শেষের ইলেক্ট্রনগুলোকে কক্ষচ্যুত করা যায়। এর কারণ হল আপাতঃ দৃষ্টিতে শেষের কক্ষে চারটি মুক্ত ইলেক্‌ট্রন থাকলেও সিলিকন এবং জার্মেনিয়ামের কৃষ্টালের গঠন এমন যে শেষের চারটি ইলেক্‌ট্রনের প্রত্যেকে পাশের অন্য একটি পরমাণুর শেষের কক্ষের ইলেক্‌ট্রনের সাথে এক ধরণের টানে আটকা থাকে। একে বলা হয় কো-ভ্যালেণ্ট বণ্ড। এর ফলে শেষের ইলেক্ট্রনগুলো সহজে তড়িৎ পরিবহণে অংশ নিতে পারে না। অবশ্য খানিকটা শক্তি ব্যয় করলে এই ইলেক্‌ট্রনগুলোর বন্ধন মুক্তি ঘটিয়ে কক্ষচ্যুত করা যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রেও পরিবহণের মাত্রা খুবই কম।

মজার ব্যাপার হ'ল বিশুদ্ধ সিলিকন বা জার্মেনিয়ামের সাথে খুব অল্প পরিমাণ (যেমন ১ কোটি ভাগের সাথে ১ ভাগ) আর্সেনিক বা ফসফরাস মিশিয়ে দিলে মিশ্রিত সিলিকন বা জার্মেনিয়ামের তড়িৎ পরিবহণ ক্ষমতা অনেকগুণ বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে আর্সেনিক বা ফসফরাসের পরমাণুগুলো সিলিকন (বা জার্মেনিয়ামের) কৃষ্টালের মধ্যে এমনভাবে ঢুকে গিয়ে জায়গা বেছে নেয় যার ফলে আর্সেনিক বা ফসফরাসের পরমাণুর শেষের কক্ষের পাঁচটির মধ্যে চারটি ইলেকট্রন চারটি সিলিকন পরমাণুর একটি করে ইলেকট্রনের সাথে সহবন্ধুত্ব (co-valence) স্থাপন করে। সহজেই বুঝা যায় পঞ্চম ইলেকট্রনটি অনেকাংশে মুক্ত। এই ইলেকট্রনগুলো তড়িৎ পরিবহণে অংশ নেয় এবং মিশ্রিত সিলিকন (বা জার্মেনিয়ামের) তড়িৎ পরিবহণ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। অবশ্য এইভাবে তড়িৎ পরিবাহিতা বাড়াবার জন্য আর্সেনিক এবং ফসফরাসের বদলে বোরণ, গ্যালিয়াম বা ইণ্ডিয়াম নামক মৌলকেও ব্যবহার করা হয়।

এদেরকে বলা হয় ইম্পিউরিটি (impurity) এবং মিশিয়ে দেওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় ডোপিং (doping)।

প্রথম ক্ষেত্রে যে সিলিকন (বা জার্মেনিয়াম) তৈরি হয় তাদেরকে বলা হয় n-টাইপ এবং শেষের ক্ষেত্রে যে ধরনের সিলিকন (বা জার্মেনিয়াম) তৈরি হয় তাদেরকে বলা হয় p-টাইপ।

এই দুই ধরনের সেমিকণ্ডাক্টরকে বিশেষ বিশেষ কায়দায় জুড়ে দিয়ে তৈরি হয়েছে, ইলেক্ট্রনিক্স জগতের বিস্ময় বস্তু ডায়োড, ট্রানজিস্টর, থাইরিস্টর ইত্যাদির মত বহু

সক্রিয় উপকরণ। এরা এনে দিল মানুষের সভ্যতার অগ্রগতিতে অবিশ্বাস্য বিপ্লব। ভাবতেও অবাক লাগে এই বিপ্লবের মূলে রয়েছে ট্রানজিস্টর নামক যে ছোট্ট বস্তুটি তার জন্ম হয়েছিল মাত্র সেদিন ১৯৪৮ সালে। আবিষ্কার করেছিলেন W. H. Brattain এবং J. Bardeen নামের দুজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। তারপরে এলেন ১৯৫২ সালে সক্লে নামক একজন বিজ্ঞানী যিনি তার বিশ্লেষণী প্রতিভায় বুঝতে সাহায্য করলেন ট্রানজিস্টরের নানা ধরনের চরিত্র।

বলা বাহুল্য যত সংক্ষেপে এই বিস্ময়বস্তুর জন্ম রহস্য বলা হ'ল তাদের তৈরির কায়দা কানুন এর অনেক গুণ বেশী। তবু কিছু একটু ধারণা থাকা প্রয়োজন মনে করে এই আলোচনাটুকু সেরে নেওয়া হ'ল। এবারে এক একটি উপকরণের গঠন প্রকৃতি ও তাদের প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলা যাক।

ডায়োড (Diode)ঃ এটি ধনাত্মক ও ঋণাত্মক ধরনের দুইটি সেমিকণ্ডাক্টর স্তরের সংযোগে তৈরি হয়। একটি স্তর অন্য একটি স্তরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে মিশে যাবার সুবাদে একটি বিশেষ ধর্মযুক্ত বস্তুর উদ্ভব হয়। এই বস্তুটির নাম ডায়োড (diode)। বিশেষ ধর্ম হল—একটি স্তরকে অন্য স্তরের সাপেক্ষে ধনাত্মক বিভব মাত্রায় তুললে স্তরের সংযোগ পথের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে কিন্তু বিপরীত বিভব মাত্রায় তুললে বিদ্যুৎ পরিবহণ বন্ধ হবে। অর্থাৎ এটি একটি সুইচের মত কাজ করবে। এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে ডায়োডকে ইলেক্ট্রনিক্স জগতে নানাভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। এসি মেইন্‌স এর দ্বিমুখী বিদ্যুৎ বিভবকে এই ডায়োড-এর সাহায্যে সহজেই একমুখী করা সম্ভব। এই একমুখীকরণকে বলা হয় রেক্টিফিকেশন (rectification)। আবার এমন এক ধরনের ডায়োড রয়েছে যাদেরকে বিপরীত বিভব সম্পন্ন করে বিভবের মাত্রা বাড়িয়ে গেলে হঠাৎ তাদের পরিবহণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। ডায়োডের এই অবস্থাকে ব্রেকডাউন অবস্থা বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন ডায়োডের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিভব প্রয়োগে এই ব্রেকডাউন অবস্থা আসে। এই জাতের ডারোডকে জেনার ডায়োড বা অ্যাভালান্স ডায়োড বলে (zener diode বা avalanche diode)। কোন পরিবর্তনশীল ইনপুট ভোল্টেজকে একটি স্থিরমান সম্পন্ন আউটপুট ভোল্টেজ হিসেবে পাবার জন্য জেনার ডায়োডের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

ট্রানজিস্টর (Transistor)ঃ আগেই বলা হয়েছে ট্রানজিস্টরের আবিষ্কার বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে কতটা ত্বরাণ্বিত করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এটি তৈরি করতে সেমিকণ্ডাক্টরের তিনটি স্তরের প্রয়োজন। এই তিনটি স্তরকে বিশেষ কায়দায় পরপর সংযুক্ত করে যে বস্তুটির সৃষ্টি হয় সেটি হল বিজ্ঞানের বিস্ময় বস্তু ট্রানজিস্টর। একটি ছবির সাহায্যে এই স্তর বিন্যাসকে বোঝান হল।

এই ছবিটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে কখনও দুইটি p-টাইপ বা ধনাত্মক ধরনের সেমিকণ্ডাক্টরের মাঝখানে যুক্ত থাকে n-টাইপ বা ঋণাত্মক ধরনের একটি স্তর। আবার কখনও থাকে ঠিক বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ দুইটি ঋণাত্মক ধরনের স্তরের মাঝখানে থাকে

একটি ধনাত্মক ধরনের একটি স্তর। এই দুই প্রকার বিন্যাসজাত ট্রানজিস্টরের নাম যথাক্রমে PNP ট্রানজিস্টর এবং NPN ট্রানজিস্টর। এই তিনটি স্তরের মধ্যস্তরকে বলা হয় বেস (base) আর দুইপ্রান্তের স্তর দুটির একটি হল কালেক্টর (collector) এবং অপরটি হল এমিটার (emitter)। ছবি দেখলেই বুঝতে পারা যাবে এই দুই
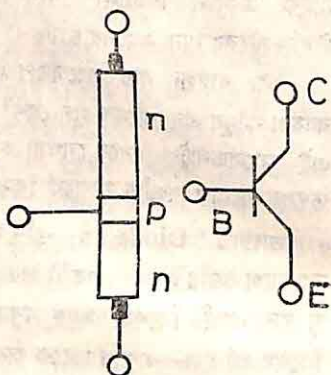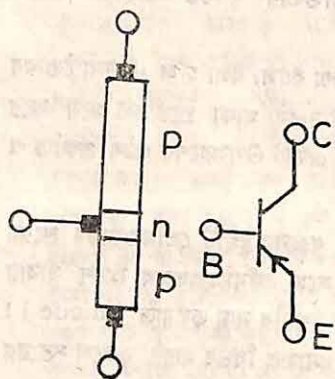
ট্রানজিস্টারের গঠন প্রকৃতি

ধরনের ট্রানজিস্টরকে কেমন চিহ্ন দ্বারা বোঝান হয়ে থাকে। এবারে আসা যাক এই ট্রানজিস্টরের ধর্মের প্রসংগে। যেহেতু ধর্মের বিস্তৃত আলোচনার এটি উপযুক্ত জায়গা নয়, তাই দু-একটি অতি প্রয়োজনীয় কথা বলেই ট্রানজিস্টরের আলোচনা শেষ করব।

(ক) যদি কখনও একটি ট্রানজিস্টর-এর বেস টার্মিনালে বাইরে থেকে সামান্য একটু তড়িৎ প্রবাহ ঘটে তবে ট্রানজিস্টরটি সেই তড়িৎ প্রবাহের অনেকগুণ প্রবাহ কালেক্টর ও এমিটার টার্মিনাল মারফৎ বের করে দেয়। অর্থাৎ একটি ট্রানজিস্টর তড়িৎ প্রবাহের বিবর্দ্ধক বা অ্যামপ্লিফায়ার-এর মত কাজ করে।

(খ) যখন বাইরের বিদ্যুৎ বিভবের প্রভাবে একটি ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে অন্য একটি লোডে বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটে তখন এই ট্রানজিস্টরটি একটি রোধের কাজ করতে পারে। নিষ্ক্রিয় রোধের সাথে এর মৌলিক পার্থক্য হল এই রোধ প্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য। এই দ্বিতীয় ধর্মের প্রয়োগ করে রেগুলেটেড পাওয়ার সাপ্লাই (Regulated Power Supply) তৈরি করা হয়ে থাকে।

(গ) উপরিউক্ত ধর্মের দুইটি চরম অবস্থা হল—শূন্য রোধ বা অসীম রোধ অবস্থা। আমরা জানি একটি বিদ্যুৎ পরিবাহী সুইচেরও ঠিক এক ধর্ম, কখনও অন্ বা শূন্য রোধ আবার কখনও অফ্ বা অসীম রোধ। দেখা যাচ্ছে, একটি ট্রানজিস্টরকেও বিদ্যুৎ প্রবাহের ক্ষেত্রে একটি সুইচের মত ব্যবহার করা সম্ভব।

(ঘ) দেখা যায় কালেক্টর এবং এমিটার মধ্যস্থিত বিভবের মাত্রা বাড়লে প্রথমদিকে কালেক্ট'র প্রবাহও বাড়বে। একই বিভবমাত্রায় বেসের প্রবাহ বাড়ালে কালেক্টরের প্রবাহও বাড়ে। কিন্তু কালেক্টর ও এমিটার মধ্যবর্তী বিভবমাত্রা একটি বিশেষ মানকে

ছাড়িয়ে গেলে একই বেস প্রবাহে কালেক্ট'র প্রবাহের মান অপরিবর্তিত থাকে। কালেক্ট'র প্রবাহের এই অপরিবর্তিত থাকার ধর্মকে কোন লোডের বিদ্যুৎপ্রবাহের স্থিতিকরণের (stabilisation) কাজে লাগান হয়।

বলা বাহুল্য বিভিন্ন ধর্মের এমনা অসংখ্য ব্যবহারিক প্রয়োগ রয়েছে।

এস. সি. আর. (SCR) ঃ এই বস্তুটির পুরো নাম হচ্ছে সিলিকন কনট্রোল্ড রেক্টিফায়ার। কেউ কেউ আবার সেমিকণ্ডাক্টর কনট্রোল্ড রেক্টিফায়ার (Silicon controlled Rectfier, Semiconductor controlled Rectifier) ও বলে থাকেন। যাই হোক আসলে এটি হচ্ছে একটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য ডায়োড বা রেক্টিফায়ার। এটি কেমন করে কাজ রে সে প্রসঙ্গে যাবার আগে এর তৈরি পদ্ধতির বিষয়ে দু-একটি কথা বলা যাক।

এস সি আর তৈরির জন্য সেমিকণ্ডাক্টরের চারটি স্তরকে পরপর সংযুক্ত করা হয়। ছবি দ্রষ্টব্য।
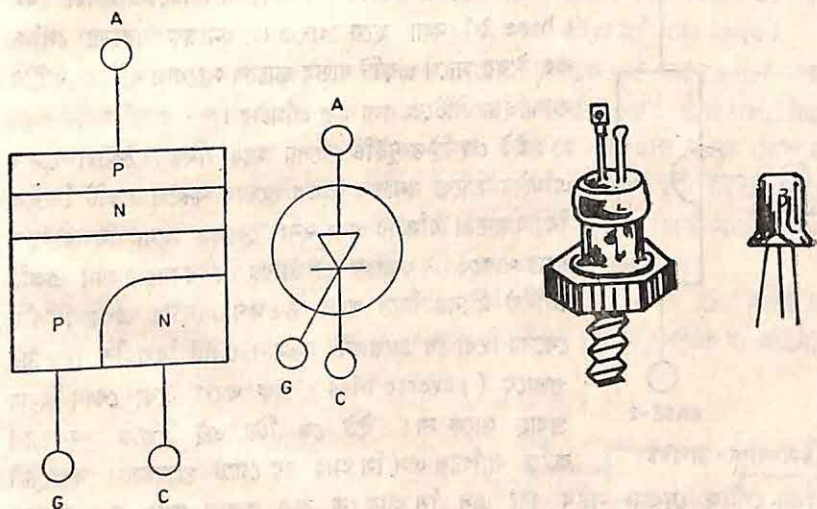
এস. সি. আর

উপরের পি (P) স্তরকে বলা হয় অ্যানোড (Anode, A), নিচের দুটি স্তরের একটি ক্যাথোড (Cathode, C), অপরটি গেট (Gate, G)।

স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যানোডকে ক্যাথোডের তুলনায় অধিকতর ধণাত্মক করলে দুটি টার্মিনালের মধ্যে কোন বিদ্যুৎপ্রবাহ হবে না। কিন্তু যদি এই বিভব বর্তমান থাকা অবস্থায় গেট টার্মিনালে ক্যাথোড সাপেক্ষে একটি ধনাত্মক পাল্‌স্ অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ বিভব দেওয়া হয় তবে অ্যানোড থেকে ক্যাথোড অভিমুখে বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে। একবার এই প্রবাহ শুরু হলে গেটের আর কোন ভূমিকা থাকে না। এই প্রবাহ বন্ধ করতে হলে

অ্যানোডকে ক্যাথোড সাপেক্ষে ঋণাত্মক করতে হবে যাতে অ্যানোড প্রবাহ শূন্য (বা তার খুব কাছাকাছি) হয়।

আজকাল নানা আকৃতির এবং ক্ষমতা বিশিষ্ট এস সি আর দেশেই তৈরি হয় এবং ইলেকট্রনিক্স-এর নানা ক্ষেত্রে এর বহুল ব্যবহার রয়েছে। এ সি এবং ডি সি বিদ্যুৎ প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে এগুলির ব্যবহারিক সাফল্য বিস্ময়কর।

আবার নানা ধরনের সার্কিট তৈরি করে এস সি আর-এর সাহায্যে মোটরের ঘূর্ণনগতি নিয়ন্ত্রণ করা, চুল্লির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার মত অসংখ্য কাজ করা সম্ভব হয়েছে।

ইউনিজাংশন ট্রানজিস্টর (Unijunction transistor) ঃ এর গঠন পদ্ধতি বোঝানোর জন্য নিচের ছবিটি দ্রষ্টব্য।

একটি ঋণাত্মক ধরনের সেমিকণ্ডাক্টর দণ্ডের সাথে ধনাত্মক ধরনের একটি সেমিকণ্ডাক্টরের সংযোগ ঘটিয়ে ইউ জে টি (UJT) তৈরি করা হয়। দণ্ডটির দুই প্রান্তে দুটি ধাতব সংযোগ তার বের করা হয় যাদের একটিকে একনম্বর বেস (base 1) এবং অপরটিকে ২নম্বর বেস (base 2) বলা হয়ে থাকে। ধনাত্মক ধরনের সেমিকণ্ডাক্টরের সাথে একটি ধাতব তারের সংযোগ ঘটিয়ে বাইরে আনা হয়, এটিকে বলা হয় এমিটার।
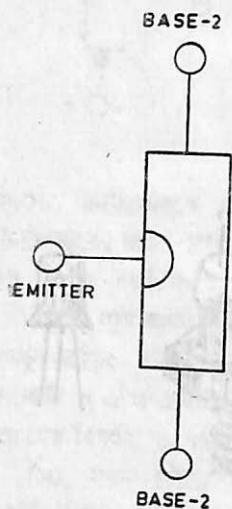
ইউনিজাংশন ট্রানজিস্টর

ইউ জে টি-র দুইটি বেসের মধ্যে বিভব বৈষম্য রেখে এমিটার প্রান্তে ধনাত্মক বিভব প্রয়োগ করলে একটি বিশেষ বিভব মাত্রায় এমিটার এবং ২নং বেসের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ হতে থাকবে। যতক্ষণ এমিটারের বিভব মাত্রার মান একটি নির্দিষ্ট মানের নিচে থাকে ততক্ষণ এমিটার এবং দ্বিতীয় বেসের মধ্যে যে ডায়োডটি বর্তমান সেটি বিপরীত বিভবের প্রভাবে (reverse bias) অফ থাকে এবং কোন বিদ্যুৎ প্রবাহ থাকে না। ইউ জে টির এই ধর্মকে সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়ে এস সি আর এর গেটে প্রয়োজনে ক্ষণস্থায়ী বিভব পৌঁছে দেওয়া সম্ভব এবং এস সি আর কে অফ অবস্থা থেকে অন্ অবস্থায় নেওয়া সম্ভব। তাই হামেশাই এস সি আর-এর সাথে ইউ জে টির ব্যবহার দেখা যায়।

ট্রায়াক (Triac) ঃ আমরা দেখলাম এস সি আর-এর সাহায্যে কোন বিদ্যুৎ উৎস থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। বিশেষ বিশেষ সার্কিটের সাহায্যে এসি ভোল্টেজ-এর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয় অংশের জন্যই এই নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই কাজটি অনেক সহজেই করা যায় আর একটি সক্রিয় উপকরণের সাহায্যে। সেটি হল ট্রায়াক। এটি আসলে দুটি এস সি আর কে পিঠোপিঠি (back to back) অবস্থায় যুক্ত করলে যেমন হয় তেমনি।

একটি এস সি আর এ সি ভোল্টেজের শুধু ধনাত্মক অংশকে প্রবাহিত করে, ঋনাত্মক

অংশের প্রবাহ বন্ধ রাখে, কিন্তু উপরিচিহ্নিত অবস্থায় দুটি এস সি আরকে যুক্ত করে ট্রায়াক তৈরি হয় বলে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয় অংশের এসি ভোল্টেজকে এটি প্রবাহিত হতে দেয়—অবশ্যই যদি যথাসময়ে প্রয়োজনীয় গেট পাল্‌স্‌টি থাকে।

আই সি (IC) ঃ আমাদের অনেকেই এই কথাটির সঙ্গে পরিচিত। এর পুরো নাম হল ইনটেগ্রেটেড সার্কিট (integrated circuit) যার অর্থ হল অনেক সার্কিটের সমন্বয়। উন্নত কারিগরি বিদ্যার সাহায্যে একসঙ্গে বহু সার্কিটকে একটি মাত্র সেমি-কণ্ডাক্টর বেস থেকে তৈরি করা হয়। ভাবতে পারেন এক ইঞ্চি বর্গক্ষেত্র পরিমাণ বেসে কয়েক হাজার সার্কিটকে বানান হচ্ছে? এই IC নানা ধরনের কাজের উপযোগী করে বানান হয়। কেউ শুধু amplifier আর কেউ বা শুধু অসিলেটর (oscillator)-এর কাজ করে। আবার এমন আই সি ও পাওয়া যায় যার একটির সাহায্যে একটি রেডিও বানান সম্ভব। অবশ্য সাথে দু একটি অন্য উপকরণ জুড়তে হবে। আবার একটি টিভি সেটের অধিকাংশ সার্কিটের কাজ চালিয়ে দেবার জন্য একটি বা দুটি আই সি ই যথেষ্ট। এই আই সি বাজারে পাওয়া যায় নানা আকারে, এদের পিনের সংখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন। তবে যত জটিল কাজই করুক না কেন এর ভেতরে রয়েছে কয়েকটি সহজ সার্কিটের সমন্বয়।

এতো গেল তাত্ত্বিক আলোচনা, ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে এই আলোচনাকে একটু অন্য দিকে নিয়ে যাব। সেটি হ'ল—এই সক্রিয় উপকরণগুলোর প্রান্তগুলো চিনে নেওয়ার কাজ। বলা বাহুল্য এই উপকরণগুল্যের গঠন যেমনই হোক বাইরে থেকে তা বোঝার উপায় নেই। বাইরের ধাতব প্রান্ত বা টার্মিনালের যে কোন দুটি প্রান্তের ভিতর রোধ মেপে রোধের তুলনামূলক বিচার থেকে সেই উপকরণটির প্রান্তকে চিনে নেওয়া সম্ভব। দেখা যাক এক একটি উপকরণের জন্য এই কাজটি কেমন করে করা যাবে।

ডায়োড (Diode) ঃ এটির দুটি মাত্র প্রান্ত রয়েছে। একটি রোধ মাপা যন্ত্র (ohm meter) ব্যবহার করে বুঝে নিতে হবে এর কোন্ প্রান্তটি ধনাত্মক বা অ্যানোড
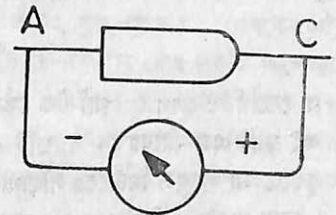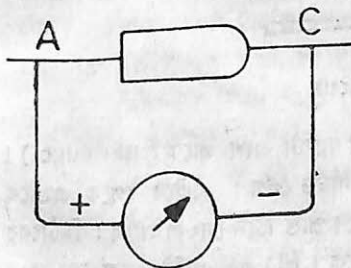
ডায়োডের টার্মিনাল পরীক্ষা

এবং কোন প্রান্তটি ঋণাত্মক বা ক্যাথোড। মিটারের ধনাত্মক প্রোব (probe) কে ডায়োডের যে কোন একটি প্রান্তের সাথে যুক্ত করে অন্য প্রান্তটিকে মিটারের ঋণাত্মক প্রোব (probe) এর সাথে যুক্ত করতে হবে। মিটারের স্কেল থেকে রোধের মান দেখে নিতে হবে। এবারে প্রোবের প্রান্ত দুটিকে ডায়োডের প্রান্তের সাথে বিপরীত ভাবে

যুক্ত করতে হবে এবং রোধের মান দেখে নিতে হবে। যে সময় রোধ কম হচ্ছে সেই অবস্থায় মিটারের ধনাত্মক প্রোবটি ডায়োডের যে প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত ছিল সেই প্রান্তটি অ্যানোড অন্য প্রান্তটি ক্যাথোড। বলা বাহুল্য এই ভাবে প্রান্ত চিনতে গেলে মিটারের প্রোবের বিভব চিহ্ন সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা করে নিতে হবে অর্থাৎ মিটারের প্রোবের কোন প্রান্তটি ধনাত্মক আর কোন্ প্রান্তটি ঋণাত্মক তা জানা থাকতে হবে। ছবি দেখলে এই মাপার কায়দা সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হবে।
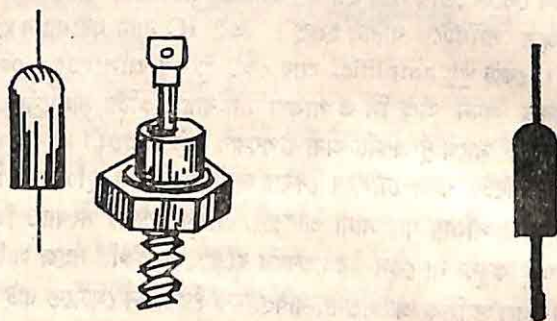
ডায়োড

আলোক বিচ্ছুরণ ডায়োড (L E D)ঃ আগেই বলা হয়েছে এটি এমন এক ধরনের ডায়োড যার ভেতর দিয়ে সামান্য পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ হলেই এর থেকে আলো বেরিয়ে আসে। প্লাস্টিক কেসের ভেতরের দিকে তাকিয়ে বাইরে থেকে এই ডায়োডের প্রান্ত চেনা সহজ। ভেতরের যে প্রান্তটি বড় (ছবি দেখুন) সেটি হল—ঋণাত্মক প্রান্ত
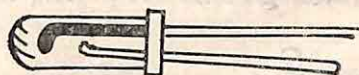
আলোক বিচ্ছুরণ ডায়োড

বা নেগেটিভ লেগ। প্লাস্টিক কেসের গায়ে একটি চ্যাপ্টা অংশ থাকে (flat edge)। এই ফ্ল্যাট এজ বরাবর যে প্রান্তটি সেটি হ'ল নেগেটিভ লেগ। বাইরে থেকে এভাবে বুঝতে না পারলে মিটারের সাহায্য নিয়ে নির্ভুলভাবে প্রান্ত চিনে নেওয়া সম্ভব। মিটারের (রোধ scale-এ মিটারকে set করে) ধনাত্মক প্রান্তকে LED-এর একটি প্রান্তে যুক্ত করে মিটারের ঋণাত্মক প্রান্তকে LED-এর অপর প্রান্তের সাথে-যুক্ত করুন। মিটারের নব (knob) ঘুরিয়ে কম রোধে রেখে দেখতে হবে আলো জ্বলছে কিনা। যদি জ্বলে তবে বুঝতে হবে মিটারের ঋণাত্মক প্রান্তটি LED-এর নেগেটিভ লেগ আর না জ্বললে বুঝতে হবে LED-এর নেগেটিভ লেগটি মিটারের ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত রয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে মিটারের প্রান্ত পরিবর্তন করে দেখে নেওয়া ভাল আলো জ্বলছে কিনা।

ট্রানজিস্টর : বিভিন্ন আকারে ট্রানজিস্টর দেখতে পাওয়া যায় (ছবি দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন প্রস্তুতকারক ট্রানজিস্টরের গায়ে একটি চিহ্নের সাহায্যে বুঝিয়ে দেয় কোন্ টার্মিনালটি এমিটার বা কালেক্টর। এই বিশেষ চিহ্নটি কোন কোন ক্ষেত্রে একটি রঙের দাগ আবার কখনও এটি কেসের গায়ে একটি ট্যাগ। এই ভাবে এমিটার (বা কালেক্টর) চিনে নিলে বাকি থাকবে বেস এবং কালেক্টর (বা এমিটার) চিনে নেবার কাজটি। এমন
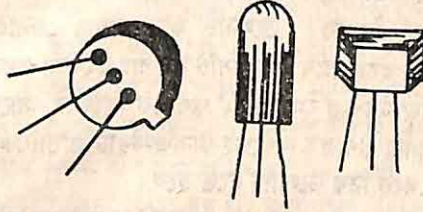
ট্রানজিস্টর

ভাবে তিনটি টার্মিনাল কেসের বাইরে রাখা থাকে যার মাঝেরটি বেস। বুঝতেই পারছেন রইল বাকি এক। সেটি বুঝতে পারা কি আর কঠিন ?

অবশ্য এতো গেল চিহ্ন দেখে চেনা। যারা মিটার ব্যবহার করে চিনতে চান তাদের জন্য নিচের পদ্ধতিটি অনুসরণ করতে বলছি। প্রথমেই জেনে নিন ট্রানজিস্টরটি কোন্ জাতের—PNP না NPN। মিটারের ধনাত্মক প্রোবটিকে পর্যায়ক্রমে ট্রানজিস্টরের তিনটি টার্মিনালের সাথে যুক্ত করে ঋণাত্মক প্রোবটি ট্রানজিস্টরের অন্য যে কোন প্রান্তে ঠেকান। যখন দেখবেন রোধের মান খুব কম তখন বুঝবেন মিটারের ঋণাত্মক প্রোবটি PNP ট্রানজিস্টরের বেলায় বেসের সাথে যুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ বেসকে চিনে নেওয়া গেল। NPN ট্রানজিস্টরের বেলায় ব্যাপারটা একটু আলাদা। সেক্ষেত্রে এই কম রোধের বেলায় মিটারের ধণাত্মক প্রোবটি ট্রানজিস্টরের যে প্রান্তের সাথে যুক্ত সেটিই হল বেস। এবারে PNP ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে মিটারের ঋণাত্মক প্রোবকে বেসের সাথে যুক্ত রেখে ধনাত্মক প্রোবকে পর্যায়ক্রমে বাকি দুটি প্রান্তের সাথে যুক্ত করুন। দেখবেন এই অবস্থায় রোধের মান উভয় ক্ষেত্রে প্রায় সমান। তবে যে অবস্থায় রোধ একটি অপেক্ষা একটু বেশী, সেই অবস্থায় মিটারের ঋণাত্মক প্রোবটি ট্রানজিস্টরের যে প্রান্তের সহিত যুক্ত সেটি কালেক্টর এবং অন্যটি এমিটার। NPN ট্রানজিস্টরকে পরীক্ষা করার সময় মিটারের ধনাত্মক প্রোবকে বেসের সাথে যুক্ত রেখে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে তার কালেক্টর এবং এমিটারকে চিনে নিতে হবে।

অবশ্যই মনে রাখবেন

এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে, তার থেকে কয়েকটি কথা সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন। কাজের সুবিধের জন্য তাই এই অংশটি বেশ মন দিয়ে পড়ে নিতে হবে।

১। ট্রান্সফর্মারকে সব সময় এসি ভোল্টেজের সাথে যুক্ত করতে হবে। ডিসি ভোল্টেজের সাথে জুড়লে সেটি পুড়ে যাবে।

২। ইলেকৃট্রোলিটিক কনডেনসার ব্যবহারের আগে তার টার্মিনাল্ দুটি দেখে নিতে হবে। ধনাত্মক প্রান্ত ধনাত্মক বিভবের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। উল্টোটি হলে কনডেনসারটি ফেটে যাবে এবং বিপদ ঘটাবে।

৩। জেনার ডায়োডের অ্যানোড প্রান্তকে ঋণাত্মক বিভবের সাথে যুক্ত করবেন। ক্যাথোডটি যাবে ধনাত্মক বিভবে। উল্টোটি করে বসলে জেনার ডায়োডটি সরাসরি পরিবাহী হয়ে অকেজো হয়ে যাবে এবং সেটি বসাবার উদ্দেশ্য সফল হবে না।

৪। PNP ট্রানজিস্টর-এর কালেক্টরটি ঋণাত্মক বিভবের সাথে যুক্ত করতে হবে। বেসকে এমিটারের তুলনায় ঋণাত্মক রাখলেই ট্রানজিস্টরটি স্বাভাবিক ক্রিয়ার উপযুক্ত হবে। NPN ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটি হতে হবে।

৫। উচ্চমান সম্পন্ন কনডেনসারকে একবার সাপ্লাইয়ের সঙ্গে যুক্ত করে বিচ্ছিন্ন করলেও তার ধাতব পাতে তড়িৎ আধান বর্তমান থাকে তাই সেটি ছুঁলেই শক্ (shock) খাবার সম্ভাবনা থাকে। দুটি প্রান্তকে একটি স্ক্রু ড্রাইভার (screw drive)-এর সাহায্যে একসাথে ছুঁয়ে চার্জ প্রশমিত করে নিলে সে সমস্যা থাকবে না।

৬। IC ব্যবহারের সময় তাতালকে মেইনস্ থেকে খুলে নিয়ে চট্ করে পিনের ঝালের কাজ করে ফেলতে হবে। ভুল করে মেইনস্-এ লাগান অবস্থায় পিনের ঝালের কাজ করলে IC টি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অবশ্য কম ভোল্টেজের (যেমন 6v) তাতালে কাজ করলে মেইনস্ থেকে খুলে কাজ করার প্রয়োজন হবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গোড়ার কথা

হাতে কলমে ইলেক্ট্রনিক্স-এর কোন কাজ করতে গেলে কিছু কথা অবশ্যই জানতে হবে। আমরা যে কোন একটি সার্কিটের ছবি দেখে সেটিকে তৈরি করতে চাইব। এই কাজের জন্য বিভিন্ন উপকরণকে পরস্পরের সঙ্গে ঝাল দিয়ে জুড়তে হবে। এই ঝাল কথাটি soldering এর বাংলা অনুবাদ। হামেশাই solder কথাটিই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেটির সাহায্য নিয়ে কোন জায়গা গরম করে সল্ডার করা হয় সেটিকে বলা হয় তাতাল বা soldering iron বা সংক্ষেপে iron। ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন আয়রন ব্যবহার করা হয়। ট্রানজিষ্টর দিয়ে সার্কিট তৈরির জন্য সাধারণতঃ কম ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি ছোট আয়রন থাকলেই কাজ চলে যাবে। এর ক্ষমতা আনুমানিক 20 ওয়াট। যে বস্তুর সাহায্যে একটি উপকরণের কোন প্রান্তকে অন্য কোন একটি উপকরণের প্রান্ত বা তারের সাথে জোড়া হয় সেই সল্ডার তৈরি হয় সীসা এবং দস্তা নামক দুটি ধাতুর মিশ্রণে। এই মিশ্র ধাতুর সরু নলের ভিতর থাকে এক প্রকার পদার্থ যার নাম হ'ল ফ্লাক্স (flux) বা রেজিন্ (rosin) এই ফ্লাক্স প্রান্তদ্বয়কে পরিষ্কার করে ঝালটি ভাল ভাবে লাগতে সাহায্য করে। কখনও কখনও আলাদা কৌটোয় এই ফ্লাক্স পাওয়া যায়। সল্ডারের তার দেখতে কেমন তা বোঝাবার জন্য চিত্রে ব্যাখ্যা করা হল। এই চিত্রে একটি সল্ডার আয়রন সহ অন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় যন্ত্র পাতিও দেখান হয়েছে।
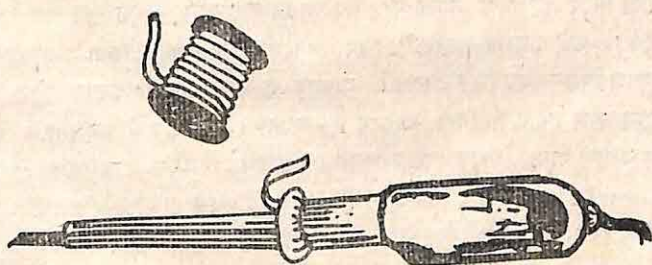
সল্ডার তার ও সল্ডার আয়রন

এবারে দেখা যাক সল্ডার করতে গেলে পরপর কেমন করে এগোন যাবে। প্রথমেই সল্ডার করার জন্য নির্বাচিত প্রান্ত গুলোকে একটি ব্লেড বা চাকুর সাহায্যে চেছে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তাতালটি মেইনের সাথে লাগিয়ে গরম করতে হবে। ভাল রকম

গরম হয়েছে কিনা বোঝার জন্য সল্ডার তারের একটি প্রান্তকে আয়রনে ঠেকিয়ে দেখতে হবে সল্ডার তারটি সহজেই গলে তরল হচ্ছে কিনা। ভাল ভাবে কাজের জন্য সল্ডার
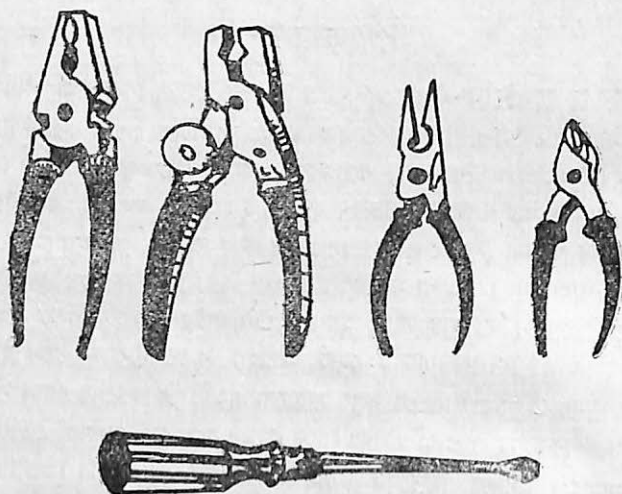
কয়েকটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

গলে যাওয়া দরকার, অন্যথায় শুকনো ঝাল (dry solder) হয়ে সার্কিটের স্বাভাবিক কাজে বাধার সৃষ্টি করবে। বস্তুতঃ পক্ষে এই ঝালের কাজটি যার যত সুন্দর হবে সার্কিটের স্বাভাবিক ভাবে কাজ করা তত বেশী নিশ্চিত হবে। বহু দিন কাজ করলে বুঝতে পারা যাবে এই ঝাল নামক কথাটির গুরুত্ব কতখানি, এতে ভেজাল দিলে সমূহ বিপদ হবে! এই ঝালের পদ্ধতি প্রকরণ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। যে জায়গায় ঝাল দিতে হবে সেই জায়গাটি যথেষ্ট গরম না হলে সল্ডার তার গলবে না এবং শুকনো ঝাল হবার সম্ভাবনা থাকবে। আবার কোন একটি জায়গাকে অনেকক্ষণ ধরে গরম করলে অন্য বিপদ হতে পারে। যেমন প্লাসটিক তার গলে যেতে পারে, প্রিনটেড সার্কিড বোর্ডের (Printed Circuit Board বা সংক্ষেপে PCB) পাতলা তামার পাত বোর্ড থেকে উঠে আসতে পারে, ডায়োড বা ট্রানজিস্টর গরম হয়ে নষ্ট হতে পারে। এমনি আরও নানা রকম ঝামেলা হতে পারে। অতএব ব্যাপারটা ঠিক শাঁখের করাতের মত, তাই না ? গরম না হলেও চলবেনা, আবার বেশী গরম হলেও বিপত্তি। অতএব ঝালের ব্যাপারে বেশ যত্নবান থাকা জরুরি।

ইলেকট্রনিক্স সংক্রান্ত কোন কাজ সফল ভাবে করতে গেলে কয়েকটি জিনিস ধৈর্য্য ধরে করতে হবে। যে বোর্ডের উপর (PCB অথবা vero board) প্রজেক্টটি করার পরিকল্পনা করা হবে প্রথমে সেই বোর্ডটি পরিষ্কার করে নিতে হবে। সার্কিটের দিকে

নজর রেখে বোর্ডের মাপ ঠিক করে নেওয়া দরকার। এবারে ভাবতে হবে বোর্ডের উপর প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো কেমন করে সাজালে সল্ডার করার কাজটি সহজ হবে এবং সার্কিটটি দেখতেও সুন্দর হবে। রোধ, ক্যাপাসিটর, ডায়োড, ট্রানজিস্টর প্রভৃতির টার্মিনালকে প্রয়োজন অনুযায়ী কেটে বোর্ডের গর্তে বসিয়ে নিয়ে পরে সল্ডার করার কাজটি সারতে হবে। একটি সাধারণ পদ্ধতি মনে রাখা দরকার। ডায়োড, ট্রানজিস্টর প্রভৃতি সক্রিয় উপকরণগুলো তাপের প্রভাবে সহজেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তাই সব শেষে এদেরকে বোর্ডের উপর গর্তের মধ্যে বসান উচিত, এবং এদেরকে একেবারে শেষে ঝালা উচিত। ঝালার কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে বোর্ডের যে দিকে উপকরণ বসান হয়েছে, তার বিপরীত দিক থেকে প্রান্তগুলোকে কেটে বোর্ডের সাথে মিলিয়ে দিলে শর্ট সার্কিটের সম্ভাবনা কম থাকে এবং সার্কিটটি দেখতেও সুন্দর হয়। এই কাটার কাজটি করার জন্য একটি ভাল জাতের কাটার (cutter) ব্যবহার করতে হবে। হ্যাঁ, সল্ডার করার সময় প্রান্তের একটু উপরে একটি সরু মুখ প্লায়ার (nose plier) দিয়ে প্রান্তটিকে ধরে নিয়ে সল্ডার করার অভ্যেস করলে কোন উপকরণ তাপে সহজে নষ্ট হবে না।

রোধ চিনবার উপায় ঃ সার্কিটে যে সব ছোট ছোট কার্বন রোধ ব্যবহার করা হয় তার মান অনেক সময় রোধটির গায়ে লেখা থাকে। রোধের একক হল ওহম (ohm) এবং এর চিহ্ন হচ্ছে Ω। এক হাজার ওহমকে এক কিলো ওহম বলা হয় এবং সংক্ষেপে $1k\Omega$ লিখে সেটিকে বোঝান হয়। যেমন 5600 Ω কে সব সময় রোধের গায়ে 5·6k দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। দশ লক্ষ ওহমকে সংক্ষেপে 1 Meg ohm বা $1M\Omega$ এই চিহ্ন দিয়ে বোঝান হয়। দশ লক্ষ কথাটির ইংরাজী প্রতিশব্দ হল মেগা। মেগ কথাটি মেগা কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। কাজেই দেখা গেল রোধের গায়ে শুধু Ω, $k\Omega$ বা $M\Omega$ লেখা থেকেই বোঝা যাবে রোধের মানটি কত। $k\Omega$ ও $M\Omega$ এর বেলায় শুধু k এবং M ব্যবহার করে কাজটি সারা হয়ে থাকে।

এতো গেল গায়ে লেখা দেখে চেনার উপায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই লেখার পাট তুলে দিয়ে রঙের সাহায্যে রোধের মান বোঝান থাকে। বর্ণালীর বিভিন্ন রঙের দাগ টেনে Ω, $k\Omega$, $M\Omega$ প্রভৃতি সুন্দর ভাবে বোঝানর একটি প্রচলিত পদ্ধতির সাথে পরিচয় করান যাক।

এই পদ্ধতিতে এক একটি রঙের একটি নির্দিষ্ট গাণিতিক সংখ্যা ও মান রয়েছে। যেমন—

কালো (Black) ঃ 0
খয়েরি (brown) ঃ 1
লাল (red) ঃ 2
কমলা (orange) ঃ 3
হলদে (yellow) ঃ 4
সবুজ (green) ঃ 5
নীল (blue) ঃ 6
বেগুনী (violet) ঃ 7
ধূসর (grey) ঃ 8
সাদা (white) ঃ 9

এবারে দেখা যাক এই দশটি রঙের নানা সমাবেশে যে কোন মানের রোধকে কেমন করে বোঝান সম্ভব। প্রথম দুটি রঙের সংখ্যা মানকে বুঝে নিয়ে তৃতীয় রঙের সংখ্যামানের সমসংখ্যক শূন্য বসিয়ে দিতে হবে। তাহলেই মোট রোধের পরিমাণ বুঝতে পারা যাবে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। মনে করি প্রথম দাগটি হলদে (yellow) পরের দাগটি বেগুনী (violet) এবং শেষের দাগটি কমলা (orange), এক্ষেত্রে রোধের মানটি হবে

হলুদ	বেগুনী	কমলা
(yellow)	(violet)	(orange)
4	7	000

অর্থাৎ 47000 Ω বা 47kΩ

আশা করি বুঝতে পারা গেল। অন্য একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও একটু পরিষ্কার হবে। ধরা যাক রঙের সমাবেশ

খয়েরি	কালো	কালো
Brown	Black	Black
1	0	×

এক্ষেত্রে রোধ হল 10Ω। এই উদাহরণে শেষের কালো (black) রঙের নিচে × চিহ্ন দিয়ে বোঝান হল এখানে শূণ্যের ঘরে শূন্যের সংখ্যা শূন্য অর্থাৎ একটিও শূন্য নেই। রঙ দেখে রোধের মান বুঝতে হলে রঙটিকে নির্ভুল ভাবে বুঝে নিতে হবে। বাকি কাজটুকু তেমন কঠিন নয়। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হলেও আস্তে আস্তে এটি সহজ হয়ে যাবে। গণ্ডগোল মনে হলে, একটি মিটার দিয়ে মেপে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে। এই রঙের পাঠ উদ্ধারের ব্যাপারে একটি সুন্দর বাক্য মনে রাখলে কাজটি সহজ হবে। বাক্যটি হল B. B. Roy of great Britain had a very good wife.

এই বাক্যটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন বর্ণ বা শব্দের প্রথম বর্ণকে বর্ণালীর রঙের প্রথম বর্ণের সঙ্গে অভিন্ন ভাবা হয় এবং রোধের মান পাঠে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে বাক্যটির প্রথম B (Black)—0, দ্বিতীয় B (Brown)—1 oy এর R (Red)—2 O (Orange)—3, Y (Yellow)—4, great এর G (Green)—5, Britain এর B (Blue)—6, very এর V (Violet)—7, good এর G (Grey)—8 এবং সবশেষে wife এর W (White)—9।

সার্কিট কাজ না করলে কি করবেন—আপনারা কোন একটি সার্কিট কষ্ট করে বানালেন। সুইচ অন করে দেখলেন প্রত্যাশিত ফলটি পাচ্ছেন না। স্বাভাবিক ভাবেই তখন লেখকের উপর চটে গিয়ে গাল মন্দ করবেন, তাই না ? আবার কেউ কেউ হয়ত হতাশ হয়ে সার্কিট তৈরির ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবেন। কিন্তু এর যে কোন একটি করার আগে আপনাদেরকে একটি ছোট উপদেশ শুনতে অনুরোধ করছি। কোন সার্কিট না চলার অনেক কারণ থাকতে পারে। যথা—

১। যে সার্কিটটি নিয়ে আপনারা কাজটি শুরু করেছিলেন তাতে কোন মৌলিক ভুল থাকতে পারে। এই ভুল লেখকের চেয়ে ছাপার দিক থেকে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তবে এই ভুল থাকলে আপনাদের কিছু করার থাকবে না। সে ক্ষেত্রে লেখক বা প্রকাশকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে ভুলটি জেনে নিতে হবে।

২। যে উপকরণ দিয়ে এটি তৈরি হয়েছে তার এক বা একাধিক উপকরণ খারাপ হতে পারে। যেমন রোধ কাটা থাকতে পারে, কনডেনসারটি লিকি (leaky) হতে পারে। ট্রান্সফর্মারটির কুণ্ডলী কাটা অথবা অন্য একটি কুণ্ডলী বা কোরের সাথে শর্ট (short) থাকতে পারে। ট্রানজিস্টরের প্রান্ত ভেতর থেকে খোলা বা শর্ট থাকতে পারে। আই সি (IC) সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। ডায়োড, জেনার ডায়োড, এস সি আর, প্রভৃতির প্রান্তগুলো শর্ট অথবা খোলা থাকতে পারে।

৩। আপনারা বিভিন্ন অংশকে যখন ঝেলেছেন সেই ঝালটি নির্ভুল না হয়ে যদি শুকনো ঝাল (dry solder) হয় তাহলেও আপনাদের সার্কিটটি ঝামেলা পাকাতে পারে। কাজ করতে করতে অভিজ্ঞতা বাড়লে বুঝতে পারবেন নির্ভুল ভাবে ঝালের কাজ করা কত গুরুত্ব পূর্ণ!

৪। যে তার দিয়ে সার্কিটের বিভিন্ন অংশকে জুড়েছেন সেই তারটি নিজেই ভিতরে কাটা থাকতে পারে। আই সি ব্যবহার করলে তার বেসের সঙ্গে আই সির নিজের সংযোগ স্থলে গণ্ডগোল থাকতে পারে।

৫। যে PCB (printed circuit board) নিয়ে সার্কিটটি করেছেন তার ভেতরেও সূক্ষ্ম কাটা বা ভুল সংযোগ থাকা সম্ভব। হয়ত বলবেন—কারণগুলোতো বুঝলাম, কিন্তু প্রতিকার কী ? হ্যাঁ, প্রতিকার করবার পদ্ধতিগুলো বলার আগে কারণগুলো তো জানতে হবে! রোগ না জেনে কি ওষুধ দেওয়া যায় ?

ত্রুটি খোঁজা ও তার প্রতিকার

সাপ্লাই ভোল্টেজ : যদি দেখেন যে সার্কিটটি চলছে না তাহলে প্রথমেই দেখতে হবে সার্কিটের যেখানে যেখানে পাওয়ার সাপ্লাই থেকে ভোল্টেজ থাকা দরকার সেই জায়গাগুলোতে ভোল্টেজ আছে কিনা বা থাকলেও তার মান ঠিক ঠিক আছে কিনা। যদি দেখেন নেই তাহলে সাপ্লাইটি পরীক্ষা করতে হবে। যদি দেখেন যে সাপ্লাই ভোল্টেজ আছে, তবে এর মান যা থাকা দরকার তার থেকে ভিন্ন। সেক্ষেত্রে সাপ্লাইটিকে আলাদা করে পরীক্ষা করে নিতে হবে। যদি দেখা যায় আলাদাভাবে ঠিক আছে তাহলে বুঝতে হবে দোষটি রয়েছে, তৈরি করা সার্কিটের মধ্যে। বলা বাহুল্য সাপ্লাই ঠিক আছে অথচ

সার্কিট কাজ করছে না তখন সার্কিটটিকে ধাপে ধাপে পরীক্ষা করে ভুলটি খুঁজে বার করতে হবে।

কাটা রোধ ঃ সার্কিটের ভুল বের করার জন্য আমরা দুটি পদ্ধতির একটি বা উভয়কে ব্যবহার করি। প্রথমটি হ'ল পাওয়ার সাপ্লাই অফ রেখে রোধ মেপে মেপে দেখা কোথায় সার্কিটটি শর্ট বা খোলা দেখাচ্ছে। রোধের ক্ষেত্রে খোলা দেখানর অর্থ রোধটি কেটে গেছে। সেটিকে তখন ফেলে দিয়ে একটি নতুন রোধ বসাতে হবে। কখনও আবার পুরো কেটে যাওয়া না দেখিয়ে অনেক বেশী রোধ দেখায়। সেক্ষেত্রেও রোধটি বাতিল করে নতুন রোধ বসাতে হবে।

শর্টেড বা লিকি কনডেনসার ঃ ইলেকট্রোলিটিক কনডেনসারগুলো হামেশাই লিকি অথবা শর্ট হয়। কোন কনডেনসার-এর দুটো প্রান্তের মধ্যে রোধ মাপলেই বোঝা যাবে কনডেনসারটি শর্ট বা লিকি হয়ে গেছে কিনা। খারাপ বুঝলে অবশ্যই পাল্টাতে হবে। এমনকি যদি খারাপ কিনা সরাসরি মেপে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে। তখনও সেটি পাল্টানই সুপারিশ করছি, কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ঠাণ্ডা অবস্থায় একটি কনডেনসার ঠিক চলছে কিন্তু গরম হলে শর্ট হয়ে যাচ্ছে। বুঝতেই পারছেন গরম হলে আমাদের অনেকেই কত ভুল করে বসি! এখানে একটি কথা বলে রাখি—পাওয়ার দেবার পর পাওয়ার অফ করার সাথে সাথে সার্কিটের বিভিন্ন অংশে হাত দিলেই যদি দেখা যায় কোন একটি বিশেষ অংশ অন্য অংশের তুলনায় অস্বাভাবিক গরম হয়েছে তাহলে বুঝতে হবে সেই অংশের কোন উপকরণ খারাপ আছে। তবে এ কাজটি করতে হবে বেশ সাবধানে কারণ কখনও কখনও শক খাবার সম্ভাবনা থাকে।

কাটা বা শর্টেড ট্রান্সফর্মার ঃ কোন সার্কিটে ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করলে দেখতে হবে প্রাইমারিতে ভোল্টেজ থাকা অবস্থায় সেকেণ্ডারিতে ঠিক ঠিক ভোল্টেজ আছে কিনা। ঠাণ্ডা অবস্থায় দেখতে চাইলে বুঝতে হবে কুণ্ডলীর তার কেটে গেছে কিনা। আবার কোর বা বডির সঙ্গে কুণ্ডলীর রোধ মাপলেই ধরা পড়বে কুণ্ডলীটি বডির সঙ্গে শর্টেড হয়ে গেছে কিনা। কখনও কখনও দুটি বা ততোধিক কুণ্ডলী নিজেদের মধ্যে পরস্পর শর্টেড হয়ে থাকে। একই পদ্ধতিতে সেটিও খুঁজে বের করা সহজ। ট্রান্সফর্মার-এর ক্ষেত্রে কখনও কখনও দেখা যায় বাইরে বের করা টার্মিনালের গোড়াটি খুলে গেছে, কিন্তু বিশেষভাবে না দেখলে এটি বোঝা যায় না। তাই যে কোন একটি ট্রান্সফর্মারকে বাতিলের আগে নিশ্চিত হতে হবে সত্যিই এটি বাতিলযোগ্য না একটু খেটে পুনরায় ব্যবহার করা সম্ভব।

ডায়োড, জেনার ডায়োড, ট্রানজিস্টর, এস. সি. আর. (Diode, Zener diode, Transistor, S. C. R.) ঃ এগুলোকে একসঙ্গে রাখা থেকেই আশা করি বুঝতে পারছেন এদের রোগগুলো একই ধরনের এবং চিকিৎসাও অভিন্ন। অবশ্য চিকিৎসা একটিই! সোজা বাতিল করা ও একটি নতুন জিনিস বসান। যদি ঠাণ্ডা অবস্থায় দেখি তাহলে ডায়োড ও জেনার ডায়োড-এর বেলায় একদিকে অতি সামান্য রোধ দেখতে

পাবো এবং অন্যদিকে অনেক বেশী রোধ দেখবো। একদিক ও অন্যদিক বলতে বোঝাচ্ছি মিটারের দুটি প্রোবকে ডায়োড-এর অ্যানোড ও ক্যাথোডের সাথে লাগিয়ে রোধ মাপার সময় যে প্রোবটি একবার অ্যানোডে লাগিয়ে রোধ মাপা হয়েছে পরের বারে সেটিকে ক্যাথোডে লাগিয়ে মাপতে হবে। যদি দেখা যায় এই রোধের মান উভয় ক্ষেত্রেই খুব কম বা খুব বেশী তাহলে বুঝতে হবে ডায়োডটি শর্ট বা খোলা। যাই হোক সেটি আর ব্যবহার করা যাবে না। এই প্রসংগে আর একটি কথা বলে রাখা ভাল। কনডেনসারের মত এই উপকরণগুলোও কখনও কখনও পাওয়ার অফ অবস্থায় ভাল দেখায় কিন্তু পাওয়ার অন্ করলে বিকল হয়ে যায়।

তাই পাওয়ার অন করে পরীক্ষা করার একটু বাড়তি সুবিধে আছে। সার্কিটে পাওয়ার অন্ করে দেখতে হবে বেস এবং এমিটারের মধ্যে ভোল্টেজ আছে কিনা। সিলিকন ডায়োডের এবং সিলিকন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে এই ভোল্টেজের পরিমাণ হবে 0·7 volt এর মত। জার্মেনিয়ামের জন্য এই ভোল্টেজের পরিমাণ 0·3 volt। এর পরে ট্রানজিস্টরের জন্য দেখতে হবে কালেক্টর এবং এমিটারের মধ্যে ভোল্টেজ আছে কিনা। যদি এই ভোল্টেজ শূন্য হয় তাহলে বুঝতে হবে কালেক্টর এমিটার শর্ট হয়ে আছে। অবশ্য একটি ট্রানজিস্টর স্যাচুরেটেড (Saturated) অবস্থায় চললেও এই মান প্রায় শূন্য হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে বেসের প্রবাহ কমিয়ে দেখতে হবে কালেক্টর ও এমিটারের মান তখনও শূন্য রয়েছে কিনা, কারণ বেসে প্রবাহ কমালে ট্রানজিস্টরটি স্যাচুরেটেড থাকতে পারবে না। এতো গেল শর্টেড অবস্থা বোঝার উপায়। কখনও কখনও কালেক্টর ও এমিটার ওপেন (open) হয়ে যায়, সেটি বুঝতে গেলে সাপ্লাই ভোল্টেজ এবং কালেক্টর প্রান্তের ভোল্টেজ মাপতে হবে। সাধারণতঃ সাপ্লাই ভোল্টেজকে একটি রোধের মধ্য দিয়ে কালেক্টর প্রান্তে যোগ করা হয়। বেসে প্রবাহ রেখে এই দুইটি ভোল্টেজ মাপলে দেখা যাবে এদের মান ভিন্ন। যদি অভিন্ন মান বর্তমান থাকে তাহলে বুঝতে হবে ট্রানজিস্টরটির কালেক্টর এবং এমিটারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন। এস. সি. আর.-এর বেলায় ঠাণ্ডা অবস্থায় রোধ মেপে ঠিক বোঝা যাবে না। কারণ উভয় দিকেই এই রোধ বেশ বেশী দেখাবে। তাই গেটে পাল্‌স (pulse) ব্যবহার করে দেখতে হবে অ্যানোড এবং ক্যাথোডের রোধ কমে যায় কিনা। যদি রোধ না কমে অর্থাৎ এস সি আর টি পরিবাহী না হয় তাহলে সেটি পাল্টে নতুন একটি এস সি আর ব্যবহার করতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বুঝতে পারছেন কোন সার্কিট ঠিক ঠিক না চললে না চলার কারণ নির্ণয়ের জন্য ধাপে ধাপে চেষ্টা করতে হবে। যদি সার্কিটের কার্যপ্রণালী যথাযথ বুঝে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায় তাহলে ভুলের কারণটি ঠিক ধরতে পারা যাবে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনটি করে নিলেই দেখা যাবে সার্কিট কাজ করতে শুরু করেছে। তাই কখনও হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

উপকরণ সংগ্রহ

কোন ইলেকট্রনিক্স প্রজেক্ট করতে বসলেই প্রথম যে ভাবনাটি মনে আসে সেটি হ'ল প্রয়োজনীয় জিনিসের সংগ্রহ। বলা বাহুল্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যারা কলকাতার ভিতরে বা তার আশে পাশে থাকেন তাদের সুবিধের জন্য জানিয়ে রাখছি—ইলেক্ট্রনিক্স উপকরণের বাজার হ'ল এসপ্ল্যানেডের কাছে ম্যাডান স্ট্রীট নামক একটি জায়গায়। বহু দোকানে এই উপকরণগুলো পাওয়া যায়।

বাজারে যাবার আগে প্রজেক্টের দিকে তাকিয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণের একটি লিস্ট তৈরি করে নিলে কেনা কাটার কাজটি সহজ হবে। কিছু কিছু উপকরণ ডজন দরে বিক্রি হয়—যেমন, রেজিস্টার, কনডেনসার। ট্রানজিস্টর, ডায়োড, জেনার ডায়োড, LED প্রভৃতি যেমন যেমন দরকার তেমন তেমন কেনা যায়, তবে কাজের সুবিধের জন্যে বেশী করে কেনা যেতে পারে। একই কথা প্রযোজ্য সলডার তার, সাধারণ তার, সুইচ, বোর্ড, নিয়ন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও। যে কোন উপকরণ বাড়ি নিয়ে আসার আগে দোকানে বসেই পরীক্ষা করে নেবার ব্যবস্থা থাকে তবে পরীক্ষা করা কাজটি যারা রপ্ত করে উঠতে পারেননি তারা দোকানীকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে বললে সাধারণত এই সাহায্য পাওয়া যায়। কোন উপকরণে ঝাল্ না লাগালে দোকানে সেটি ফেরৎ দিয়ে অন্য একটি উপকরণ নিতে সাধারণত কোন অসুবিধে হয় না। তাই বাড়ীতে এসে কোন উপকরণকে সার্কিটে বসিয়ে ঝাল দেবার আগে ভাল করে পরীক্ষা করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। এতে পয়সা এবং হয়রানি দুটোই বাঁচবে।

কেমন করে শুরু করব

কোন প্রজেক্টের প্রয়োজনীয় উপকরণ লিস্ট দেখে সংগ্রহ করার পর একটি বোর্ডের উপরে সেগুলোকে সাজিয়ে নিয়ে বসাতে হবে। যদি কেউ বাড়িতে প্রিনটেড সার্কিট বোর্ড (Printed Circuit Board PCB) তৈরি করে নেন তাহলে বসানর কাজটি সহজ হয়ে যাবে। অবশ্য PCB তৈরির আগে সার্কিটের লে-আউট (layout) টি একটি গ্রাফ কাগজে এঁকে নিতে হবে। যারা ভেরো বোর্ডে বসিয়ে প্রজেক্টটির কার্যপ্রণালী দেখতে চান তারা বুঝে বুঝে উপকরণগুলোকে বোর্ডের উপর বসিয়ে নেবেন। বোর্ডে বসিয়ে নিয়ে একবার দেখে নিতে হবে ট্রানজিস্টরের টার্মিনাল ঠিক ঠিক বসান হয়েছে কিনা। জেনারের সম্পর্কেও এ কথাটি প্রযোজ্য। যে কোন প্রজেক্টের বেলায় এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। ভুল করে ফেললে শুধু যে সার্কিটটি কাজ করবেনা তাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে উপকরণটিও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এর পর যেখানে যেখানে ঝাল দিয়ে তার জুড়তে হবে সেখানে সেটি সেরে ফেলতে হবে। একটি ব্রাশ দিয়ে পুরো সার্কিটটি পরিষ্কার করে নিয়ে পাওয়ার অন করতে হবে।

যদি উপকরণ ঠিক থাকে, সার্কিটটি নির্ভুলভাবে সম্পূর্ণ করার পর পাওয়ার অন করলে স্বাভাবিক প্রত্যাশা হল সেটি চলবে। কিন্তু যদি দেখা যায় সেটি ঠিক ঠিক কাজ করছেনা তাহলে এক এক করে সবকিছু পরীক্ষা করে নিতে হবে। (পরীক্ষা করার সাধারণ পদ্ধতি দ্রষ্টব্য)

কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত ডায়োড ট্রানজিস্টর, ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিষ্টর

ডায়োড

ডায়োড	পিক ইনভার্স্ ভোল্টেজ	কারেন্ট
BY100	800V	1A
BY114	650V	1A
BY125	100V	1A
BY126	450V	1A
BY127	800V	1A
DR50	50V	200mA
DR450	450V	200mA
DRX10	800V	200mA
DR150	1500V	250mA
E20	40V	50mA
E21	80V	50mA
E22	150V	50mA
E23	200V	50mA
E2	50V	500mA
E4	100V	500mA
E6	200V	500mA

ট্রানজিস্টর

নম্বর	টাইপ	কারেণ্ট	পাওয়ার
AC125	Ge—PNP	100mA	500mW
AC126	Ge—PNP	100mA	500mW
AC127	Ge—NPN	500mA	340mW
AC128	Ge—PNP	1A	500mW
AC176	Ge—NPN	1A	500mW
AC187	Ge—NPN	1A	800mW
AC188	Ge—PNP	1A	800mW
AD149	Ge—PNP	3·5A	32·5W
	পাওয়ার ট্রানজিস্টর		
BC107	Si—NPN	200mA	300mW
BC108	Si—NPN	200mA	300mW
BC147	Si—NPN	200mA	250mW
BC148	Si—NPN	200mA	250mW
BC149	Si—NPN	200mA	250mW
BC157	Si—PNP	200mA	250mW
BC177	Si—PNP	30mA	145mW
SK100	Si—PNP	150mA	4W
SK102	Si—PNP	500mA	3W
SL100	Si—NPN	150mA	4W
SL102	Si—NPN	500mA	3·5W

পাওয়ার ট্রানজিস্টর

নম্বর	টাইপ	পাওয়ার
2N3055	Si—NPN }	115 watt
SEM3055	Si—NPN }	115 watt
SEMNO55	Si—NPN	75 watt
AD149	Ge—PNP }	20 watt
SEM149	Ge—PNP }	20 watt

জেনার ডায়োড

জেনার ডায়োড্	ভোল্টেজ	পাওয়ার
EZ5	5·8V	200mW
EZ6	6·8V	200mW
EZ7	7·5V	200mW
EZ8	8·2V	200mW
EZ9	9·1V	200mW
EZ10	10·00V	200mW
CAZ3 0	3·0V	400mW
CAZ6·2	6·2V	400mW
1Z3·3A	3·3V	1W
1Z6·2A	6·2V	1W
3Z3·3A	3·3V	3W
3Z6·2A	6·2V	3W
3Z12A	12V	3W
3Z24A	24V	3W

চতুর্থ অধ্যায়

প্রজেক্ট তৈরী করা

এ পর্যন্ত আমরা যে সব আলোচনা করেছি সেই আলোচনাকে ভিত্তি করে কয়েকটি প্রজেক্ট তৈরির কথা বলব। এই অধ্যায়ের প্রজেক্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে কয়েকটি কথা মাথায় রাখা হয়েছে। প্রথমতঃ এই প্রজেক্টগুলো সহজ ও মজার হওয়া চাই, এবং এদের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা থাকা চাই। বলা বাহুল্য সহজ, মজার ও প্রয়োজনীয় হলে সেটি তৈরি করার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ থাকবে এটা আশা করা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ এই প্রজেক্টগুলোর মধ্যে বেশ কিছু উপকরণ সাধারণ ভাবে সবার জন্য কাজে লাগান হয়েছে। এতে উপকরণ সংগ্রহের বিষয়টি সরল হবে এবং প্রয়োজনে একটি প্রজেক্ট সম্পূর্ণ করার পর (অবশ্যই এটির সফল কার্যকারিতা প্রমাণিত হবার পর) এটিকে ভেঙে এর উপকরণ দিয়ে অন্য একটি প্রজেক্ট তৈরী করা সম্ভব হবে। তৃতীয়তঃ শুধু ট্রানজিস্টরকে কাজে লাগিয়ে (UJT নির্ভর দুটি প্রজেক্টকে ধরে) সমস্ত প্রজেক্টগুলোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হ'ল—প্রজেক্টগুলো ধাপে ধাপে করতে শিখলে ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর হবে বলে আমার আশা।

সবশেষে একটি কথা বলে প্রজেক্টগুলোর মূল বর্ণনার বিষয়ে মনোনিবেশ করব। ইলেকট্রনিক্স প্রজেক্ট-এর নানা বইয়ে বহু সার্কিটের আলোচনা থাকে কিন্তু সেগুলোর কার্যপ্রণালী বিশেষভাবে বোঝানোর অভাবে সেগুলো থেকে নতুন শিক্ষার্থীরা বিশেষ কিছু শিখতে পারে বলে আমার মনে হয় না। এই বইয়ের ক্ষেত্রে যে কোন প্রজেক্টের কার্যপ্রণালী বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলা হয়েছে। আশা করি এর ফলে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশী মজা পাবে, এবং বুঝে বুঝে প্রজেক্ট তৈরি করার মত জ্ঞান ও সাহস অর্জন করবে।

প্রজেক্টের মূল আলোচনায় আসার আগে ট্রানজিস্টরের বিষয় আরও কিছু কথা বলা প্রাসঙ্গিক। তাই জার্মেনিয়াম ও সিলিকন ধরনের দুটি ট্রানজিস্টরের তুলনামূলক আলোচনা, সার্কিট তৈরির ক্ষেত্রে দু'একটি বহুল ব্যবহৃত কায়দা এবং সবশেষে মূল প্রজেক্ট এবং তাদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। সেমিকণ্ডাকটর বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সময় বলা হয়েছে যে বিশেষ কয়েকটি সেমিকণ্ডাকটর পদার্থকে ব্যবহার করে যাবতীয় সক্রিয় উপকরণ যেমন ডায়োড, ট্রানজিস্টর, ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর প্রভৃতি তৈরি করা হয়। এই তৈরি করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু স্থানাভাবের জন্য তার আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু জার্মেনিয়াম ও সিলিকনকে বহুল ব্যবহার করে এই উপকরণ তৈরি হয়ে থাকে এবং এই বইটিতে কয়েকটি ট্রানজিস্টর সার্কিটের বর্ণনা রয়েছে—তাই দুই ধরনের দুটি ট্রানজিস্টরের তুলনামূলক একটি লিস্ট

দেওয়া হ'ল। জার্মেনিয়ামের বেলায় ফরওয়ার্ড বায়াসে রেখে বেস এবং এমিটারের মধ্যে বিভবের মাত্রা হচ্ছে—0·3 volt আর একই অবস্থায় একটি সিলিকন ট্রানজিস্টরের বেলায় এই বিভবের মান হ'ল—0·65 volt.। এ ছাড়া আর একটি বিশেষ কথা মনে রাখা দরকার। জার্মেনিয়াম ট্রানজিস্টরে লিকেজ কারেন্টের মান অনেক বেশী হওয়ায় এর বায়াস সার্কিট বেশ জটিল করার দরকার হয়, যাতে এই লিকেজ কারেন্ট কম রাখা যায়। কিন্তু সিলিকন ট্রানজিস্টরে লিকেজ কারেন্ট স্বাভাবিক ভাবেই কম করা সম্ভব।

এবারে যে দুটি ট্রানজিস্টরের তুলনামূলক আলোচনা দেওয়া হয়েছে তাদের বিষয়ে কিছু বলা যাক্।

	AC128 Ge—PNP	BC147 Si—NPN
V_{CBO} (max)	32V	50V
V_{CEO} (max)	32V	45V
I_C (max)	1A	100mA
P_{total} (max)	155mW	250mW
h_{fe}	80	>125 <500

উপরের লিস্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে এমিটার খোলা অবস্থায় কালেকটর ও বেসের মধ্যে সর্বোচ্চ যে বিভব [V_{CBO}(max)] প্রয়োগ করা সম্ভব তার মান AC128 এর বেলায় 32V কিন্তু BC147-এর বেলায় 50V। আবার বেস খোলা রেখে কালেক্টরও এমিটারের মধ্যে সর্বোচ্চ বিভবের মান AC128 ও BC147-এর বেলায় যথাক্রমে 32V ও 45V। সর্বাধিক কালেক্টর কারেন্টের মাত্রা প্রথমটির ক্ষেত্রে 1 Amp, কিন্তু দ্বিতীয়টির বেলায় মাত্র 100mA. সর্বোচ্চ যে পাওয়ার বিকিরণে সক্ষম তার মান যথাক্রমে 155mW ও 250mW। সবথেকে বেশী নজর কাড়ার মত তফাৎ রয়েছে h_{fe} (যার দ্বারা গেইন সম্পর্কে ধারণা করা হয়) এর মানে। AC128-এর বেলায় $h_{fe} = 80$ আর BC147-এর বেলায় এর মান 125 থেকে 500-এর মধ্যে। এই তুলনামূলক আলোচনা থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে BC147 ব্যবহারের বিশেষ জায়গা হল অডিও অ্যামপ্লিফায়ারের ড্রাইভার ষ্টেজে এবং টেলিভিশন সেটের বিভিন্ন সিগন্যাল প্রসেসিং সার্কিটে; আর AC128-এর ব্যবহার করার বিশেষ জায়গা হল—অ্যামপ্লিফায়ার রেডিও রিসিভার বা টেপরেকর্ডারের আউটপুট ষ্টেজে।

সার্কিট নিয়ে কাজ শুরু করার আগে আরও দু'একটি কথা মনে রাখা দরকার। যেমন

—কোন সার্কিটে PNP ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা থাকলে উপযুক্ত পরিবর্তন করে নিয়ে NPN ট্রানজিস্টর দিয়েও কাজ করা যাবে। আবার জার্মেনিয়াম জাতীয় ট্রানজিষ্টরের বদলে সিলিকন জাতীয় ট্রানজিস্টর ব্যবহারেও নীতিগত কোন অসুবিধে নেই, তবে ডিজাইনটি একটু আধটু বদলে নেওয়ার প্রয়োজন।

এবারে আমরা কয়েকটি সার্কিটকে হাতে কলমে করার কথা বলব।

এমিটার ফলোয়ার (Emitter follower): পাশে একটি এমিটার ফলোয়ার সার্কিট দেখান হয়েছে। এমনিভাবে একটি ট্রানজিস্টরকে ব্যবহার করলে সহজেই প্রমাণ করা সম্ভব যে সার্কিটটির ইনপুট ইমপেডান্স (input impedance)-এর মাত্রা অনেকগুণ বেড়ে যায় এবং আউট ইমপেডান্স-এর মান খুব কমে যায়। অর্থাৎ ট্রানজিস্টরটি যেন একটি ইমপেডান্স ট্রান্স ফরমারের কাজ করছে। বলা বাহুল্য বেশী ইনপুট ইমপেডান্স থাকলে ট্রানজিস্টরটি সোর্স (source) থেকে অনেক কম কারেন্ট টানবে এবং ইনপুট সিগন্যালের প্রায় সবটাই কাজে লাগবে। এখানে আর একটি কথা বলে রাখা দরকার। এমিটার ফলোয়ারের ভোল্টেজ গেইন এক অপেক্ষা সামান্য কম কিন্তু পাওয়ার গেন অনেক বেশী। ট্রানজিস্টরের β যত বেশী, ইনপুট ইমপেডান্স এবং পাওয়ার গেইনও তত বেশী।
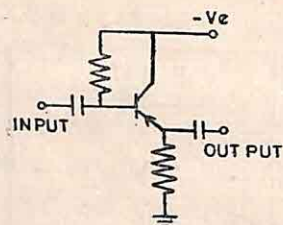
এমিটার ফলোয়ার

ডার্লিংটন পেয়ার (Darlington pair): কখনও কখনও দুটি ট্রানজিস্টরকে
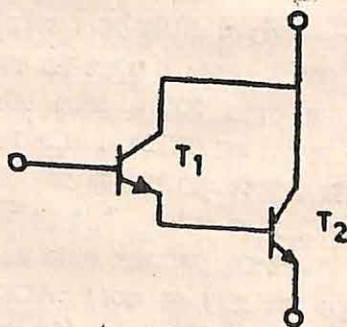
ডার্লিংটন পেয়ার

বুদ্ধি খাটিয়ে একটি বিশেষ কায়দায় ব্যবহার করলে অনেকগুণ বেশী গেইন পাওয়া সম্ভব। যদি একটি ট্রানজিস্টরের গেইন β_1 এবং অপরটির গেইন β_2 হয় তাহলে এই ধরনের সংযোগের বেলায় মোট β-র পরিমাণ দাঁড়াবে $\beta_1 \times \beta_2$। এইভাবে দুটি ট্রানজিস্টরের জুটিকে বলা হয় ডার্লিংটন পেয়ার। বলা বাহুল্য যেখানে খুব বেশী মাত্রায় গেইন দরকার

হবে তেমন সব জায়গায় ডার্লিংটন পেয়ার একটি আদর্শ সমাধান। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে প্রথম ট্রানজিস্টরের এমিটারটি দ্বিতীয়টির বেসে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং উভয়ের কালেক্টর একসাথে যুক্ত হয়ে সাপ্লাই ভোল্টেজের সাথে লাগান রয়েছে।

ট্রানজিস্টর বায়াস ঃ প্রথমেই দেখা যাক বায়াস (bias) কথাটি সার্কিটের বেলায় কী অর্থে ব্যবহার করা হয়। যে কোন একটি ট্রানজিস্টরকে সার্কিটে ব্যবহার করতে চাইলে সেই ট্রানজিস্টরটির তিনটি প্রান্তে ডিসি ভোল্টেজ প্রয়োগ করে রাখতে হবে। কেমন করে এই ডিসি ভোল্টেজ প্রয়োগ করে রাখতে হবে সে কথা পরে বলছি। কোন এসি সিগন্যাল আসার আগে তিনটি প্রান্তের ডিসি ভোল্টেজকে ঐ ট্রানজিস্টরের বায়াস ভোল্টেজ বলা হয়। এই বায়াস ভোল্টেজ এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে বেস ও এমিটার ডায়োডটি ফরোয়ার্ড বায়াস (forward bias) অবস্থায় থাকে এবং বেস ও কালেক্টর ডায়োডটি রিভার্স বায়াস (reverse bias) অবস্থায় থাকে। এর থেকে আলাদা কোন অবস্থায় বায়াস করলে ট্রানজিস্টরটি স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারবে না। এবারে দেখা যাক্ PNP এবং NPN ধরণের ট্রানজিস্টরের বেলায় প্রযুক্ত ভোল্টেজের ঋণাত্মক ও ধনাত্মক টার্মিনাল কেমন করে জুড়তে হবে। পরবর্তী কয়েকটি সার্কিটের সাহায্যে এই সংযোগের বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়া হ'ল। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, PNP ধরনের বেলায় ট্রানজিস্টরটির এমিটার টার্মিনাল বেসের তুলনায় ধনাত্মক ভোল্টেজে রয়েছে এবং কালেক্টরটি রয়েছে বেসের সাপেক্ষে ঋণাত্মক ভোল্টেজে। অপরপক্ষে NPN জাতের বেলায় এমিটার প্রান্তটি বেসের সাপেক্ষে ঋণাত্মক ভোল্টেজে এবং কালেক্টর প্রান্তটি বেসের তুলনায় ধনাত্মক ভোল্টেজে রয়েছে।
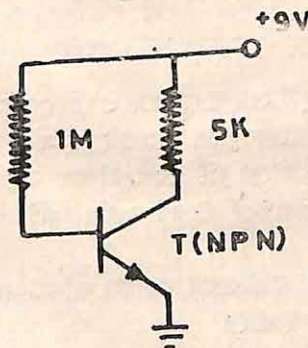
বায়াস পদ্ধতি

বায়াস পদ্ধতি ঃ বায়াস কী এবং বায়াসের সাধারণ পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সেকথা একটু আগেই বলেছি। এবারে আমরা দেখব কেমন সার্কিটটি করলে এই বায়াস করার কাজটি সহজে সারা যাবে।

বায়াস করার সহজতম পদ্ধতিটি ছবিতে দেখান হ'ল। এখানে একটি মাত্র সাপ্লাই এবং দুটি রোধ ব্যবহার করে ট্রানজিস্টরটি বায়াস করা হয়েছে। এমিটার প্রান্তটি সরাসরি গ্রাউণ্ডের সাথে জুড়ে দেওয়া আছে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এমিটার প্রান্তটিও একটি রোধের সাহায্যে গ্রাউণ্ডে জোড়া হয়।

এভাবে বায়াস করার সুবিধে হ'ল এটি খুব সহজ। কিন্তু এর অসুবিধে হ'ল বায়াস ভোল্টেজের মান স্থির থাকে না। অবশ্য খুব জটিল ও নিখুঁত সার্কিট না হলে এভাবে কাজ চালিয়ে নেওয়ার কোন বাধা নেই।

এর চাইতে উন্নততর পদ্ধতিটি নিচের সার্কিটে দেখান হয়েছে।
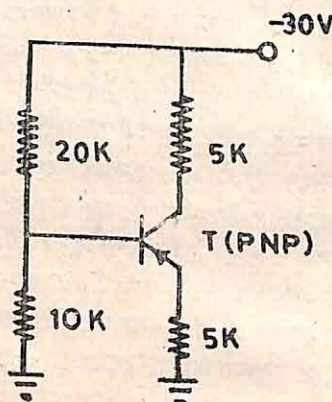
বায়াসের দ্বিতীয় পদ্ধতি

এক্ষেত্রে সাপ্লাই থেকে দুটি রোধের সাহায্যে একটি ভোল্টেজ ডিভাইডার (voltage divider) সার্কিট বানিয়ে রোধ দুটির সংযোগ স্থলে ট্রানজিস্টরের বেসটি লাগান হয়েছে। কালেক্টর ও এমিটারে দুটি রোধ বসিয়ে কালেক্টর প্রবাহ সীমিত করার কাজটি সারা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি এটি একটি ব্যাপক ব্যবহৃত বায়াস পদ্ধতি।

এবারে আমরা তৃতীয় একটি বায়াস পদ্ধতির সার্কিট সম্বন্ধে বলব। এই সার্কিটটি পরের পৃষ্ঠায় ছবিতে দেখান হয়েছে।

এখানেও একটিমাত্র সাপ্লাই ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমটির মত এখানেও দুটি মাত্র রোধ ব্যবহার করেই বায়াস করার কাজ শেষ করা সম্ভব। প্রথমটির সাথে এর তফাত হচ্ছে—এক্ষেত্রে বেস বায়াসটি সাপ্লাই থেকে না নিয়ে ট্রানজিস্টরের কালেক্টর থেকে নেওয়া হয়েছে। এই সামান্য পরিবর্তনের ফলেই বায়াস ভোল্টেজকে অনেক বেশী স্থির রাখা সম্ভব।

আরও নানাভাবে বায়াস করার প্রচলিত পদ্ধতি আছে। প্রত্যেকটি পদ্ধতির নিজস্ব সুবিধে ও অসুবিধে রয়েছে সেকথা আশা করি বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন নেই। একটি কথা বলা যেতে পারে যে এখানে যে কটি সার্কিট দেখান হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে একটি মাত্র সাপ্লাই ব্যবহার করা হয়েছে। যদি একাধিক সাপ্লাই থাকে তাহলে বায়াস সার্কিটে অনেক বেশী বৈচিত্র্য আনা সহজ। প্রদত্ত সার্কিটের রোধের মান ইচ্ছে মাফিক কমিয়ে এবং বাড়িয়ে নিয়ে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মেটাবার কোন বাধা নেই।

বায়াসের তৃতীয় পদ্ধতি

বায়াস নিয়ে যেটুকু আলোচনা করলাম আশা করা যায় নতুন শিক্ষার্থীরা এর থেকে উপকৃত হবেন। এবারে আমরা আর একটি মূল্যবান বিষয়ে কিছু বলব। বুঝতে পারছি অনেকেই এত কিছু আলোচনা পছন্দ করছেন না বা ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলছেন। শুধু তাদের উদ্দেশ্যেই বলছি। সরাসরি কিছু প্রজেক্ট তৈরি করে ইলেকট্রনিক্স শেখা যায় না। তাতে হয়ত কিছু একটা করলাম বলে তৃপ্তি হতে পারে কিন্তু সেইটুকুই বুঝে করতে পারলে সেই তৃপ্তি অনেকগুণ বেশী হবে। তাই তত্ত্বের দিকটি অবহেলা করা অনুচিত ভেবেই বর্তমান আলোচনাটুকু সেরে ফেলার কথা ভাবলাম।

আমরা দেখেছি ট্রানজিস্টরের তিনটি প্রান্ত রয়েছে। যে কোন সার্কিটে এটিকে এমনভাবে বসান হয় যাতে দুটি প্রান্তের মধ্যে ইনপুট সিগন্যাল প্রয়োগ করে অন্য দুটি
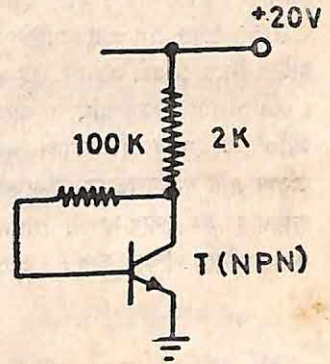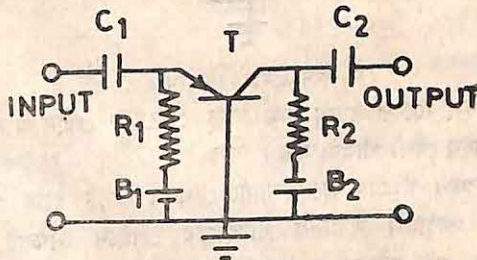
কমন বেস সংযোগ

প্রান্তের মাঝে আউটপুট সিগন্যাল সংগ্রহ করা হয়। বলা বাহুল্য উভয়ক্ষেত্রে একটি প্রান্ত সাধারণ বা কমন (common) থাকবে। অর্থাৎ বেস, এমিটার এবং কালেক্টরের মধ্যে যে কোন একটি প্রান্ত কমন থাকতে হবে। বস্তুতঃপক্ষে এই তিন প্রকারের যে কোন একটির সংযোগ সহযোগে সার্কিট তৈরির ব্যাপারটি হামেশাই আমাদের চোখেপড়বে।

এবারে আমরা এই তিন প্রকার সংযোগ ব্যবস্থাগুলো সার্কিটের সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করব।

প্রথম চিত্রটিতে কমন বেস অবস্থায় ট্রানজিস্টরটিকে রাখা হয়েছে। এই অবস্থায় এমিটার ও বেস টার্মিনালের মাঝে ইনপুট প্রয়োগ করে কালেক্টর ও বেস টার্মিনালের মাঝে আউটপুট সংগ্রহ করা হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রে বেস কমন থাকার জন্য এটিকে কমন বেস সংযোগ (common base connection) বলা হয়। সার্কিটে C_1 এবং C_2 এই ক্যাপাসিটর দুটি যথাক্রমে ইনপুট এবং আউটপুট সিগন্যালকে বায়াস ব্যাটারী থেকে আলাদা রাখে। কিন্তু এসি ইনপুট সিগন্যালটি ট্রানজিস্টরের C_1 মারফৎ এমিটারে সহজেই প্রযুক্ত হয় এবং আউটপুট সিগন্যালটি অনুরূপভাবে কালেক্টর থেকে C_2 মারফৎ বাইরে নিয়ে নেওয়া হয়। এই ক্যাপাসিটর দুটি যথাক্রমে ইনপুট ও আউটপুট কাপলিং (coupling) ক্যাপাসিটর নামে পরিচিত। এইভাবে ট্রানজিস্টরকে ব্যবহার করলে সার্কিটের ইনপুট রেজিস্ট্যান্স খুব কম এবং আউটপুট রেজিস্ট্যান্স খুব বেশী হয়। অবশ্য এটি সাধারণভাবে সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশী সৃষ্টি করে। কিন্তু কোন কোন জায়গায় কম রোধ সম্পন্ন সিগন্যালকে ব্যবহার করার সময় কমন বেস সংযোগ ব্যবহার করার সুবিধে পাওয়া যায়। আর একটি কথা মনে রাখা উচিত। এই সংযোগের
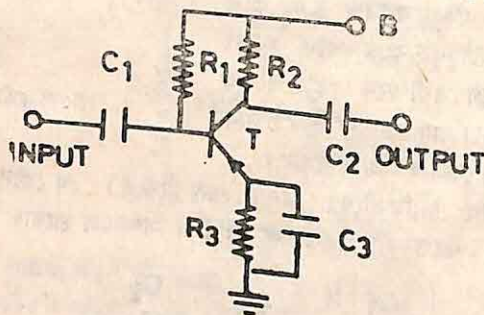
কমন এমিটার সংযোগ

বেলায় কারেন্ট গেইন একের চেয়ে কম কিন্তু ভোল্টেজ গেইন অনেক বেশী হওয়ার সাকুল্যে পাওয়ার গেইন বেশী পাওয়া যায়।

এবারে আমরা কমন এমিটার কানেকশানটি দেখব। এটি হচ্ছে সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতি। বুঝতেই পারছেন সর্বাধিক ব্যবহারের পেছনে নিশ্চয়ই কোন মূল্যবান কারণ আছে। হ্যাঁ, এই ধরনের কানেকশানে কারেন্ট এবং ভোল্টেজের গেইন অনেক বেশী। ফলে পাওয়ার গেইন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তাছাড়া ইনপুট ও আউটপুটরোধের ব্যাপারটিও কমন বেস কানেকশানের চেয়ে অনেক বেশী সুবিধাজনক।

সবশেষে আমরা দেখব কমন কালেক্টর কানেকশান। এটি সাধারণভাবে এমিটার ফলোয়ার নামে পরিচিত। এই আলোচনার আগেই এটির বিষয়ে কিছুটা বলা হয়েছে বলে এখানে আর পুনরোল্লেখ করা হল না।

১নং প্রজেক্ট

একটিমাত্র ট্রানজিস্টর ব্যবহার করে কেমন করে একটি রিলের (relay) সাহায্যে পাখা আলো অথবা অন্য কোন যন্ত্রপাতি চালান যায় তার একটি সার্কিট বর্ণনা করা হচ্ছে। বস্তুতপক্ষে এই সার্কিটটিকে কাজে লাগিয়ে যে কোন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকেও বেশ চমকপ্রদ করা যেতে পারে। নিচের ছবিতে সার্কিটটি দেওয়া হল।

সার্কিটের A এবং B বিন্দুর মধ্যে যতক্ষণ কোন তড়িৎবাহী তারের যোগ থাকবে ততক্ষণ ট্রানজিস্টরের বেস এবং এমিটার সরাসরি যুক্ত থাকার ফলে এটি কাজ করতে পারবে না। যখন A এবং B বিন্দুর সংযোগ ছিন্ন হবে তখন ট্রানজিস্টরটি কারেন্ট টানতে থাকবে এবং রিলে কয়েলে কারেন্ট প্রবাহ ঘটবে। ট্রানজিস্টারের এমিটারটি সাপ্লাইর ঋণাত্মক প্রান্তে যুক্ত থাকা চাই। রিলের D এবং E বিন্দুর মধ্যে তখন সংযোগ স্থাপিত হবে। এই অবস্থায় লোড (পাখা বা আলো)-র মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটবে এবং সেটি সক্রিয় হবে। এবারে বলছি কেমন করে এই ছোট্ট এবং সহজ সার্কিটকে কাজে লাগিয়ে কোন অনুষ্ঠানকে চমকপ্রদভাবে উদ্বোধন করা যেতে পারে। লোড ব্লকের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলো এবং উদ্বোধনী সংগীতের একটি রেকর্ডকে রেকর্ড প্লেয়ারে বসিয়ে প্রস্তুত রাখা হ'ল। A এবং B বিন্দুর মধ্যে যে বৈদ্যুতিক সংযোগ তার রাখা আছে সেটিকে একটি ফিতের ভেতর দিয়ে লুকিয়ে রেখে আড়াআড়িভাবে রাখা হ'ল। এবারে যিনি অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করবেন তিনি একটি কাঁচির সাহায্যে ফিতেটি কেটে দিয়ে দ্বারোদ্ঘাটন করার সাথে সাথে রিলের স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা (N/o) প্রান্তদুটির মধ্যে সংযোগ ঘটবে এবং আলো জ্বলে উঠবে। সাথে সাথে বাজতে শুরু করবে উদ্বোধনী সংগীতের রেকর্ডটি। তাক লাগিয়ে দেবার পক্ষে এটি বেশ একটি মজার ব্যবস্থা নয় কি ?
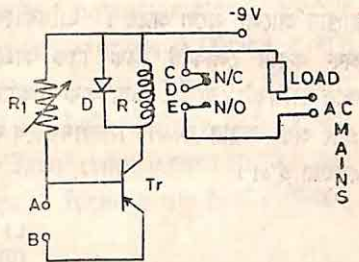
ফিতে কাটলেই উদ্বোধনী সংগীত

প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা

১। T_r —ট্রানজিস্টর AC128 অথবা অন্য কোন সমতুল (equivalent)।

২। D—ডায়োড—BY125।

৩। R_1—1K, $\frac{1}{2}$W পোটেনসিওমিটার (Potentiometer)।

৪। R—6V রিলে।

৫। 9V ব্যাটারী বা ব্যাটারী এলিমিনেটর।

৬। সুইচ, তার, প্লাগ, সলডার তার ইত্যাদি।

২নং প্রজেক্ট

রাস্তায় অটোমেটিক আলোর ব্যবস্থা

আমাদের অনেকেরই জানা আছে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অন্ধকারে আলো জ্বলছে না। আবার বিপরীত অভিজ্ঞতাও রয়েছে আমাদের—দিনে দুপুরে রাস্তায় আলো জ্বলে আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারণটি হল—সময় মত অন অথবা অফ করার লোকটি ঠিক ঠিক কাজ করছে না। বেশ তো লোকের উপর নির্ভর না করে দায়িত্বটা ছেড়ে দেওয়া যাক একটি ইলেকট্রনিক সার্কিটের উপর। সময় মত অন এবং অফ করার কাজটি নিরলসভাবে করবে এই সার্কিটটি। নিচের ছবিতে সার্কিটটি দেওয়া হ'ল।
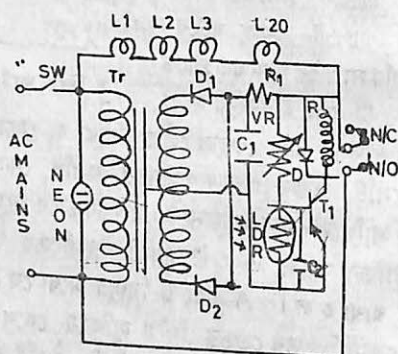
রাস্তায় অটোমেটিক আলো

এবারে বলা যাক্ সার্কিটটি কেমন করে কাজ করে। এই সার্কিটটির একটি মূল্যবান অংশ হ'ল LDR (light dependent resistance)। LDR-এর ধর্ম হচ্ছে এর রোধের পরিমাণ নির্ভর করবে এটির উপর যে পরিমাণ আলো পড়ছে তার উপর। যত বেশী আলো পড়বে, রোধ তত কম হবে। যখন একদম আলো পড়বে না তখন এই রোধের পরিমাণ হবে বেশ বেশী। LDRটি একটি কালো কাগজের নলে ঢুকিয়ে এমনভাবে রাখতে হবে যেন এই নলের মুখ দিয়ে এর উপরে আলো পড়তে পারে। আলো বেশী থাকলে LDR এর রোধ প্রায় শূন্যের কাছাকাছি হওয়ায় ট্রানজিস্টরের বেস এবং এমিটার সরাসরি যুক্ত থাকবে। ফলে ট্রানজিস্টরটি সক্রিয় হবে না এবং রিলেটিও সচল হবে না। L_1, L_2, L_3 প্রভৃতি বাল্বগুলো সিরিজে যুক্ত হয়ে রিলের স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা (normally open) প্রান্তদুটিতে যুক্ত আছে। রিলে সচল

না হলে এই বাল্বগুলো এসি মেইনস্‌-এর সাথে যুক্ত হয়ে বর্তনী সম্পূর্ণ হতে পারবে না। অর্থাৎ যতক্ষণ LDR-এর উপর আলো থাকবে ততক্ষণ বাল্বগুলো জ্বলবে না। যখন LDR-এর উপর আলো পড়া বন্ধ হবে (যেমন সন্ধ্যার পরে) তখন LDR-এর রোধের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং ট্রানজিস্টরটি সক্রিয় হয়ে রিলেটিকে সচল করবে। এর ফলে N/o প্রান্তদ্বয় যুক্ত হবে এবং এসি মেইনস্‌ থেকে সিরিজে যুক্ত বাল্বগুলোকে জ্বালিয়ে দেবে। পুনরায় দিনের আলো পড়লে ট্রানজিস্টরটি সক্রিয় থাকতে পারবে না এবং রিলেটি অচল হয়ে বাল্বগুলোকে অফ করবে।

সঠিকভাবে কাজ করার জন্য ভ্যারিয়েবল রেজিস্টর (potentiometer) VR-কে ঘুরিয়ে এমন মানে সেট করতে হবে যেন আলোহীন অবস্থায় LDR-কে রাখলে ট্রানজিস্টরটি সক্রিয় হয়ে রিলেটি সচল করতে পারে। কখনও কখনও রিলেটি সচল হবার জন্য যে পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ দরকার একটি মাত্র ট্রানজিস্টর দিয়ে সেটি পাওয়া যায় না। তেমন ক্ষেত্রে দুটি ট্রানজিস্টরকে ডার্লিংটন জোড়া হিসেবে যুক্ত করে কাজ করতে হয়। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে। রিলের প্রান্তটি N/C টার্মিনালে যুক্ত নয় বলে ভাবতে হবে।

সার্কিটের প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ট্রানজিস্টর T_1—AC 188 তাপ বিকিরক সহ।
২। ডায়োড D_1, D_2, D—BY 127।
৩। স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার 230V/9V, 500 mA।
৪। ক্যাপাসিটর C_1—1000 mfd, 12V, ইলেক্ট্রোলিটিক
C_2—0·1 mfd, 150V, পলিয়েস্টার।
৫। রেজিস্টর—R_1—47K, VR—100K, LDK—1।
৬। রিলে—6V D.C. 220Ω, SPDT সহ।
৭। 12V বাল্ব কুড়িটি, তার, সুইচ, নিওন, বোর্ড, সলডার তার প্রভৃতি।

৩নং প্রজেক্ট

লোডশেডিং-এর সময় অটোমেটিক টর্চ

হঠাৎ লোডশেডিং। কী যন্ত্রণা। অন্ধকারে দেশলাই খুঁজে বের করাও কঠিন। এমন অবস্থার সঙ্গে আমরা সবাই অল্প বিস্তর পরিচিত। বেশী আলোর যোগান দেওয়া ব্যয়সাপেক্ষ কিন্তু একটু আলোর ব্যবস্থা করে অন্ধকারেও পরস্পরের সঙ্গে গল্প করার মত আলোর যোগান দেওয়ার দায়িত্ব নিতে পারে এমন একটি সরল ও সস্তা সার্কিটের বিষয় আলোচনা করছি। সার্কিটটি দেখান হয়েছে নিচের চিত্রে।
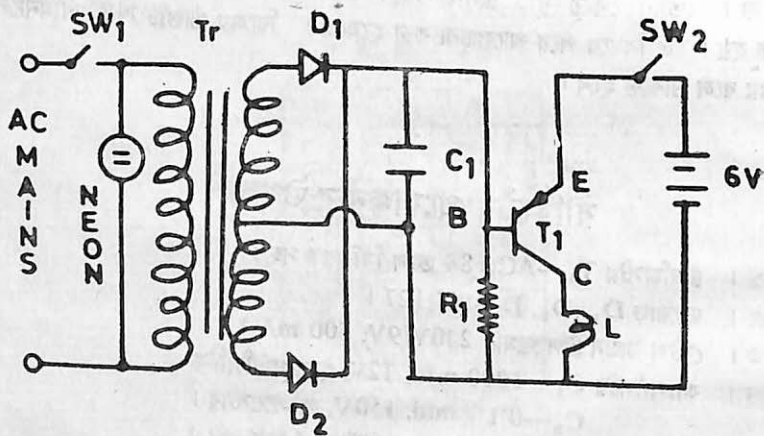
লোডশেডিং হলেও আলো

মনে করা যাক মেইনস্-এ পাওয়ার রয়েছে। এবারে সার্কিটটির কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যখন সুইচ SW_1 অন অবস্থায় থাকবে তখন ট্রানজিস্টরের বেস B বিন্দুতে বেশ খানিকটা (9V) ধনাত্মক ভোল্টেজ রয়েছে। যেহেতু T_1 একটি PNP ট্রানজিস্টর, সেইহেতু সেটি সক্রিয় হতে পারবে না। ফলে ট্রানজিস্টরের কালেক্টর-এর সঙ্গে যুক্ত টর্চের বাল্ব L-টি জ্বলবে না। কিন্তু হঠাৎ যখন মেইনস্-এর পাওয়ার অফ হবে (অর্থাৎ load shedding) তখন ব্যাটারীর রোধ R_1-এর মধ্য দিয়ে বেস প্রবাহ শুরু হবে এবং ট্রানজিস্টরটি সক্রিয় হবে। সক্রিয় অবস্থায় কালেক্টর প্রবাহ বাল্ব L-এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার ফলে বাল্বটি জ্বলতে থাকবে এবং অন্ধকারের হাত থেকে আংশিক রেহাই পাওয়া যাবে।

একটি গ্যাং সুইচের সাহায্যে SW_1 এবং SW_2 যুক্ত করে নিলে কাজের সুবিধে হবে। দিনের বেলায় এই সুইচ দুটি অফ করে রেখে দিতে হবে।

এই সার্কিটটির সম্পর্কে দু একটি কথা জেনে রাখা ভাল। রাতের বেলা অন অবস্থায় R_1 রোধের মধ্য দিয়ে কিছুটা পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহের ফলে একটু বিদ্যুৎ খরচ হতে থাকবে। বলা বাহুল্য এর পরিমাণ অতি নগন্য। দীর্ঘস্থায়ী লোডশেডিং-এর ক্ষেত্রে L বাল্বটি বেশী উজ্জ্বল অবস্থায় জ্বললে কেটে যাবার সম্ভাবনা আছে। এর প্রতিকার হিসেবে 9V রেটিংয়ের বাল্ব ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। এতে আলো একটু কম হবে কিন্তু বাল্ব এবং ট্রানজিস্টরটি অনেকদিন টিকবে। 9V বাল্ব জোগাড় করা কঠিন হলে কয়েকটি বাল্বকে সিরিজে যোগ করে নিলেও কাজ চলবে।

সার্কিটের প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ট্রানজিস্টর T_1—AC 188 তাপ বিকিরক সহ।
২। ডায়োড D_1, D_2—BY 125 বা BY 127।
৩। কনডেনসার C_1—100 mfd, 12V, ইলেকট্রোলিটিক।
৪। স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার 230V/9V, 500 mA।
৫। রেজিস্টর R_1—1000Ω, 2w।
৬। গাং সুইচ, নিওন, তার, বোর্ড, সলডার তার, ব্যাটারী, বাল্ব ইত্যাদি।

৪নং প্রজেক্ট

হাত বাড়ালেই জল

দুই নম্বর প্রজেক্টটি হাতে কলমে করার পর এই প্রজেক্টটি করা খুব সহজ। এখানে একটি LDRকে একই ভাবে কাজে লাগিয়ে একটি অথবা প্রয়োজনে দুটি ট্রানজিস্টরকে ব্যবহার করে একটি রিলেকে অন অথবা অফ করা হয়। এই রিলের সাহায্যে একটি তড়িত চালিত জলের ভাল্বকে (magnetic valve) খোলা বা বন্ধ করার ব্যবস্থা থাকে। সাধারণ ক্ষেত্রে জলের লাইনে যে ভাল্ব ব্যবহার করা হয় সেটিকে যান্ত্রিক বল প্রয়োগে বন্ধ করা বা খোলা হয়। এক্ষেত্রে সেটি অচল। বাজার থেকে একটি তড়িৎ চালিত ভাল্ব যেটি সলিনয়েড ভাল্ব (solenoid valve) নামে অধিক পরিচিত, জোগাড় করে জলের লাইনে লাগিয়ে নিতে হবে। এবারে সার্কিটটি নিচে দেখান হল এবং কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
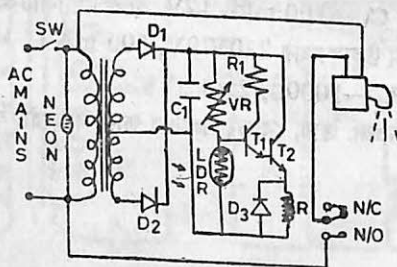
হাত বাড়ালেই জল

এসি মেইনস থেকে একটি স্টেপ ডাউন ট্রানসফর্মার (step down transformer) এর সাহায্যে ভোল্টেজ কমিয়ে D_1 ও D_2 এই ডায়োড দুটির সাহায্যে এসি ভোল্টেজকে ডিসিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই ডিসি ভোল্টেজকে VR (একটি potentiometer) এবং LDR-এর সাহায্যে ভোল্টেজ ডিভাইডার (voltage divider) তৈরী করে T_1 ট্রানজিস্টর-এর বেসকে সাপ্লাই দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। T_1 এবং T_2 এই দুটি ট্রানজিস্টর এক্ষেত্রে ডার্লিংটন জোড়-এর কাজ করে বলে এদের গেইন খুব বেশী হয় ফলে রিলেটি সচল করা সহজতর হয়। একটি আলোর উৎস থেকে (যেমন একটি টর্চের আলো) আলো নিয়ে একটি লেন্স (lens) এর সাহায্যে LDR-এর উপর ফোকাস করার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যবস্থা এমন ভাবে করতে হবে যেন কলের তলায় হাত দিলে এই আলোরশ্মি LDRএর উপরে পড়তে না পারে। কলের বা-দিকে আলো রেখে LDRকে ডান দিকে রাখলেই এই ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা সম্ভব।

যখন আলো সরাসরি LDR এর উপর পড়বে তখন এর রোধ খুব কমে যাবে। VRকে ঘুরিয়ে এমন ভাবে এর মানকে সেট করে নিতে হবে যেন এই অবস্থায় T_1 ট্রানজিস্টরটি সচল হতে না পারে। T_1 সচল না হলে T_2 ও সচল হবে না, রিলেটিও সক্রিয় হতে পারবে না। যেহেতু এসি মেইনস থেকে সলিনয়েড ভাল্বের তড়িৎ সরবরাহ করা হয়েছে, রিলের N/o প্রান্ত মারফৎ, রিলে সক্রিয় না হলে ভাল্ব এর তড়িৎ সরবরাহ ব্যাহত হবে এবং ভাল্বটি বন্ধ থাকবে। ফলে কল থেকে জল পড়বে না।

এবারে দেখা যাক হাত পাতলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায়। কলের তলায় হাত পাতলে বাম দিক থেকে আলো ডান দিকে রাখা LDR-এর উপর পড়তে পারবে না। এর ফলে LDR-এর রোধের পরিমাণ বাড়বে এবং T_1 ট্রানজিস্টরটির বেসে প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ পড়বে। T_1 ট্রানজিস্টরটি সক্রিয় হয়ে T_2কে সক্রিয় করবে। রিলেটিও সঙ্গে সঙ্গে সচল হয়ে সলিনয়েড ভাল্বের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ সুনিশ্চিত করবে। এর ফলে ভাল্বটি খুলে যাবে এবং জল পড়তে থাকবে। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে। LDR কে আলোর উৎস থেকে আড়াল করলে যদি ভাল্বটি খুলে না যায় তাহলে LDR-কে আড়াল করা অবস্থায় VR-কে ঘুরিয়ে এমনভাবে সেট করতে হবে যেন রিলেটি সক্রিয় হয়ে উঠে। এই সামান্য ব্যবস্থা (adjustment) টুকু করে সার্কিটটিকে একবার চালু করে ছেড়ে দিলে সেটি নিখুঁতভাবে বারে বারে কাজ করবে।

এই প্রজেক্টটি সফলভাবে করলে অনেককেই ম্যাজিক দেখাবার মত চমকে দেওয়া যাবে।

এই প্রজেক্টের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ কিনবার সময় একটু খেয়াল রাখা দরকার যে, সলিনয়েড ভাল্বটিকে সচল করার জন্য যে পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ দরকার সেই পরিমাণ প্রবাহ রিলের প্রান্তের মধ্য দিয়ে পাঠান যাবে কিনা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ট্রানজিস্টর T_1,—BC 147B, T_2—SL100।
২। ডায়োড D_1, D_2, D_3—BY125 বা BY127।
৩। LDR।
৪। স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার 230V/6V, 300mA।
৫। রিলে 6V dc - 220Ω - SPDT।
৬। ক্যাপাসিটর C_1—1000 mfd, 25V ইলেকট্রোলিটিক।
৭। রেজিস্টর—RV100K পোটেনসিওমিটার, R—10K$\frac{1}{2}$W।
৮। সলিনয়েড ভাল্ব।
৯। সুইচ, নিয়ন বাতি, তার, সলডার তার, বোর্ড ইত্যাদি।

৫নং প্রজেক্ট

জলের অপচয় বন্ধ করা

ট্যাঙ্ক ভর্তি হয়ে জল উপচে পড়ছে! তবু পাম্প বন্ধ করার নামটি নেই। একদিকে পাম্পটি অকারণে গরম হচ্ছে। অন্যদিকে বিদ্যুৎ এবং জল দুয়েরই অপচয় হচ্ছে। এ অপচয় যে ইচ্ছে করে কেউ করেন তা কিন্তু নয়। আসল কারণ হল সময় মত প্রয়োজনীয় সংকেতের অভাব। অতি সহজেই একটি সংকেত শব্দ বাজার ব্যবস্থা করা সম্ভব!
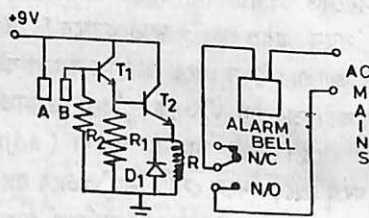
জল উপচে পড়লেই সংকেত

যে সহজ সার্কিটটির কথা বলছি, সেটি উপরের ছবিতে দেখান হল। কেমন করে এটি কাজ করে এবারে তার ব্যাখ্যা দেয়া যাক্। A এবং B হ'ল দুটি তামার বা অন্য কোন ধাতুর পাত। জলের ট্যাঙ্কের যে উচ্চতা ছাড়ালে সংকেত পাওয়া প্রয়োজন সেই উচ্চতায় এই দুটিকে বেশ শক্ত করে আটকে রাখা আছে। A পাতটিকে ইলেকট্রিক তারের সাহায্যে 9V অথবা 12V সাপ্লাইয়ের সঙ্গে যুক্ত করা আছে। অন্য পাত B-কে আর একটি তারের সাহায্যে ট্রানজিস্টরের বেসের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। T_1 ট্রানজিস্টরটিকে এখানে একটি এমিটার ফলোয়ার (emitter follower) হিসেবে ব্যবহার করে T_2 ট্রানজিস্টরটিকে ড্রাইভ (drive) করা হয়েছে। আর T_2-এর এমিটারে রাখা আছে একটি রিলে। এসি মেইনস্ থেকে একটি সংকেত ঘণ্টির সাপ্লাই দেওয়া আছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই সাপ্লাই থেকে কোন তড়িৎ প্রবাহ হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত রিলেটি সক্রিয় হয়ে N/o প্রান্ত দুটির সংযোগ ঘটায়।

যতক্ষণ পর্যন্ত জলের তল A এবং B পাতের নীচে থাকবে ততক্ষণ T_1 ট্রানজিস্টরটির বেসে কোন ভোল্টেজ না থাকায় সেটি অচল থাকবে এবং রিলেটিও সক্রিয় হয়ে সংকেত বাজাতে পারবে না। কিন্তু যখন জল বাড়তে বাড়তে A এবং B এই ধাতব পাত দুটিকে স্পর্শ করবে তখন A এবং B-এর মধ্যে একটি বাস্তব রোধের (real resistance) সৃষ্টি হবে। ফলে এই রোধ এবং R_2 মিলে একটি ভোল্টেজ ডিভাইডার (voltage

divider) তৈরি করে এবং এর ফলে T_1 ট্রানজিস্টরের বেসে বেশ খানিকটা ভোল্টেজ আসে। এই বেস ভোল্টেজ স্বাভাবিক নিয়মে T_1কে সক্রিয় করে এবং T_2টিও সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয়ে রিলেকে সচল করে তোলে। মুহূর্তের মধ্যে রিলের N/o প্রান্তদুটি যুক্ত হয়ে সংকেত ঘণ্টির কুণ্ডলীর তড়িৎ প্রবাহকে সুনিশ্চিত করে। সংকেতটিও সাথে সাথে বাজতে থাকে।

কেউ যদি এই সার্কিটটিকে কাজে লাগিয়ে পাম্পটিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করতে চান তাও সম্ভব। সে ক্ষেত্রে পাম্পের মোটরের তড়িৎ প্রবাহকে রিলের N/c প্রান্তের মধ্য দিয়ে যুক্ত করে রাখতে হবে। যখন রিলেটি সচল হবে তখন এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে তড়িৎ প্রবাহকে ব্যাহত করবে এবং মোটরটি বন্ধ হবে।

এক্ষেত্রে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বাজারে সাধারণতঃ 6V-এর যে রিলে পাওয়া যায় তার প্রান্তগুলো মোটরের পরিচালন তড়িৎ প্রবাহ বইতে সক্ষম কিনা দেখে নিতে হবে। যদি সক্ষম না হয় তাহলে এই ছোট্ট রিলেটির সাহায্যে আর একটি বড় রিলে চালিয়ে কাজটি করা যাবে। কিন্তু কাজটি খুব সহজ নয় এবং আবশ্যিক জটিলতা বর্তমান পুস্তকের ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত ভেবে এর বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হল না।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ট্রানজিস্টর T_1—BC 147B; T_2—SL 100A।
২। ডায়োড D_1—BY 125।
৩। ক্যাপাসিটর C_1—1000 mfd/25V ইলেকট্রোলিটিক।
৪। রেজিস্টর—R_1—10K$\frac{1}{4}$W, R_2—500K$\frac{1}{4}$W।
৫। রিলে R—6V—220Ω।
৬। অ্যালার্ম বেল যেমন সাধারণ কলিং বেল।
৭। তার, সলডার তার, ব্যাটারী ইত্যাদি।

এই সার্কিটে ট্রানজিস্টরের জন্য প্রয়োজনীয় সাপ্লাইটি ব্যাটারী থেকে অথবা একটি ব্যাটারী এলিমিনেটর (battery eliminator) থেকে নিতে হবে। Battery eliminator থেকে নিলে তার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ অন্য যে কোন একটি সার্কিট থেকে বুঝে নিতে হবে।

৬নং প্রজেক্ট

চোর জানানি

সবার অজান্তে বাইরের কেউ ঢুকলেই যাতে একটি সংকেত-শব্দ বা অ্যালার্ম বেজে ওঠে তার একটি সহজ সার্কিট এখানে দেখান হয়েছে। এমন ভাবে এই সার্কিটটি করা হয়েছে যাতে দরজাটি খুললেই অ্যালার্মটি বাজবে। বাড়ির লোকজন দরজাটি খুললে যাতে এই অ্যালার্ম অকারণে না বাজে তার ব্যবস্থাও এই সার্কিটে রাখা হ'ল। এমন ভাবে এটি তৈরি করা হয়েছে যাতে মেইন পাওয়ার কোন কারণে অফ থাকলেও এর কাজে কোন অসুবিধে না হয়। সার্কিটটি দেখান হল নিচের ছবিতে। এবারে দেখা যাক্ সার্কিটটি কেমন করে কাজ করে। এই সার্কিটের বিশেষ অংশটি হচ্ছে S_1 সুইচটি। এটি একটি ডোর সুইচ (door switch)। এটি নানা ধরনের হতে পারে যেমন মেকানিক্যাল সুইচ, মাইক্রো সুইচ বা চুম্বক সুইচ (mechanical type, micro switch or magnetic switch)। এমন ভাবে এটিকে লাগান হয়েছে যাতে দরজাটি বন্ধ থাকলে এটি বন্ধ বা অন থাকে। খুলে গেলে এটি খুলে যায় বা অফ অবস্থায় থাকে। এসি মেইনস অথবা তার অনুপস্থিতিতে ব্যাটারী থেকে ভোল্টেজ এসে R_1 রোধের মধ্য দিয়ে C_2 কনডেনসারটিতে চার্জ আসে। দরজাটি বন্ধ অবস্থায় C_2 এর টার্মিনাল দুটি S_1 সুইচ এর সাহায্যে শর্টেড থাকার ফলে C_2 এ কোন চার্জ জমতে পারে না। যখন কেউ দরজাটি খুলবে তখন S_1 অফ অবস্থায় থাকায় C_2 এ চার্জ জমা হবে এবং D_4 ডায়োডটির সাহায্যে T_1 এবং T_2 ট্রানজিস্টরটি সক্রিয় হবে। সঙ্গে সঙ্গে রিলেটি সচল হয়ে অ্যালার্মটি বাজিয়ে দেবে। পুনরায় দরজাটি বন্ধ হবার সাথে সাথে C_2 কনডেনসারটি শর্টেড হবার সুবাদে রিলেটিও অফ হবে। এখানে যে অ্যালার্মটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি কম ভোল্ট (6 বা 9 volt) এর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এসি মেইনস এর দ্বারা এটিকে চালাবার উপযোগী হলে লোড শেডিং এর সময় এর ক্রিয়া বন্ধ থাকবে। অথচ অন্ধকারেই এর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।
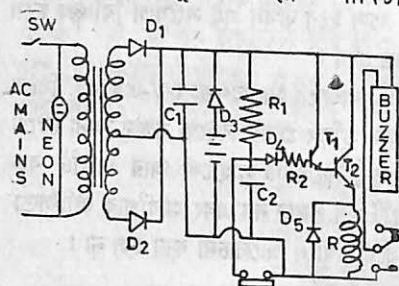
চোর জানানি

প্রয়োজনীয় উপকরণ

ট্রানজিস্টর T_1—147B, T_2—SL 100
ডায়োড D_1, D_2, D_3, D_4, D_5—BY 125
রেজিস্টর R_1R_2—100K, $\frac{1}{4}$W
ক্যাপাসিটর C_1—100μF, 25V, ইলেকট্রোলিটিক
ব্যাটারী মাইক্রো সুইচ ইত্যাদি 6V বাজার (Buzzer)

৭নং প্রজেক্ট

ব্যাটারী চার্জার

ড্রাই সেল (Dry cell) একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবার আগে তাকে পুনরায় চার্জ করে নিয়ে বেশ কিছু দিন কাজ চালান সম্ভব। স্টোরেজ ব্যাটারীর বেলায় এই চার্জ করে নেওয়া ব্যাপারটির সাথে আমাদের অনেকেরই অল্প বিস্তর পরিচয় আছে। যে সার্কিটের সাহায্যে এই চার্জিং করা হয় তাকে আমরা ব্যাটারী চার্জার (Battery charger) বলে থাকি। এটি আসলে একটি কম ভোল্টের ডিসি সাপ্লাই। কেমন করে এটি তৈরি করে এবং কেমন করে এটিকে ব্যাটারীর সাথে যুক্ত করে চার্জ করতে হয় এবারে সেটি একটি সার্কিটের সাহায্যে দেখাব। সম্পূর্ণ সার্কিটটি দেওয়া হ'ল নিচের ছবিতে।
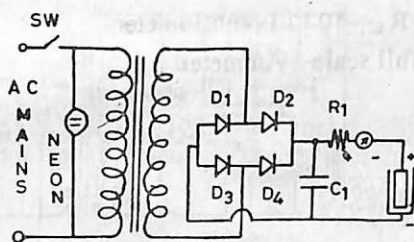
ব্যাটারী চার্জার

একটি স্টেপ ডাউন ট্রানসফরমার-এর সাহায্যে এসি মেইনস থেকে ভোল্টেজ কমিয়ে প্রয়োজন মত 6V, 9V অথবা 12Volt করা হয়। এই এসি ভোল্টেজ ৪টি ডায়োড এর সাহায্যে রেক্টিফাই করে C_1 কনডেনসার দিয়ে ফিল্টার (filter) করা হয়েছে। খুব বেশী পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ ব্যাটারীর মধ্য দিয়ে যাতে যেতে না পারে (কারণ সেক্ষেত্রে সাপ্লাইটি এবং ব্যাটারী উভয়ই নষ্ট হতে পারে) তার জন্য একটি রোধ R_1 ব্যবহার করা হয়েছে। একটি মিলি অ্যামমিটার (milli ammeter) বসিয়ে চার্জিং কারেন্ট মাপার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেহেতু এই ধরনের ব্যাটারী চার্জার সার্কিটের সাহায্যে ছোট খাট পরীক্ষামূলক চার্জিং করাই উদ্দেশ্য, অনাবশ্যক জটিলতা এতে রাখা হয়নি। যদি 6V সাপ্লাই তৈরি করা হয় তাহলে ৪টি ড্রাই সেলকে সিরিজে যুক্ত করে তার ধনাত্মক প্রান্তকে সাপ্লাইটির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করতে হবে এবং ঋণাত্মক প্রান্তকে যুক্ত করতে হবে সাপ্লাইটির ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে। এই সংযোজনের পূর্বে একটি মিলি অ্যামমিটার যুক্ত করে নিলে চার্জিং-এর প্রবাহমাত্রা মাপা সম্ভব।

কেমন করে ব্যাটারীকে সিরিজে যুক্ত করতে হয় সেটি বুঝিয়ে বলছি। একটি ব্যাটারীর ঋণাত্মক প্রান্তকে অন্য একটির ধনাত্মক প্রান্তের সহিত একটি পরিবাহী তার দিয়ে যুক্ত করতে হবে। দ্বিতীয়টির ঋণাত্মক প্রান্তকে অনুরূপভাবে তৃতীয়টির ধনাত্মক প্রান্তের সহিত যুক্ত করতে হবে। এমনি ভাবে প্রথমটির ধনাত্মক এবং শেষেরটির ঋণাত্মক প্রান্তের মধ্যে তৈরি করা সাপ্লাই-এর প্রান্তদ্বয় যুক্ত করে দিলেই চার্জিং-এর জন্য সংযোজন সম্পূর্ণ হবে। যদি কখনও কারেণ্ট মিটারের স্কেল ছাড়িয়ে যায় তাহলে R_1 রোধকে বাড়িয়ে প্রবাহমাত্রা কমিয়ে নিতে হবে। কয়েক ঘণ্টা চার্জ করলে প্রবাহমাত্রা কমে গিয়ে খুব কম একটি স্থির মান দেখাবে এবং বুঝতে হবে চার্জিং সম্পূর্ণ হয়েছে ;

প্রয়োজনীয় উপকরণ

স্টেপ ডাউন ট্রানসফরমার—১টি 230V/6V, 500 mA

২। ডায়োড D_1, D_2, D_3 D_4—BY 127

৩। কনডেনসার—C_1 1000 mfd, 25V, ইলেকট্রোলিটিক

৪। রেজিস্টর—R_1—100Ω Potentiometer

৫। 100 mA full scale—Ammeter

৮নং প্রজেক্ট

বেশী ভোল্টেজের ক্ষতি থেকে রেহাই

আধুনিক যুগে এমন অনেক যন্ত্রপাতি আছে যেগুলি একটি নির্দিষ্ট ভোলটেজ সীমার মধ্যে থেকে কাজ করে। সেই সীমার বাইরে কম অথবা বেশী যে কোন ভোলটেজের ব্যবহারে সেই সুক্ষ্ম যন্ত্রের বিকল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ ভোলটেজের সীমা পেড়িয়ে গেলেই যাতে সাপ্লাই অফ হয়ে যায় তেমন একটি ব্যবস্থা অতি অল্প খরচায় কেমন করে করা যায় সেটি নিচের সার্কিটের সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই সার্কিটটিকে ওভার ভোলটেজ প্রটেকশান (Over Voltage Protection) সার্কিট বলা হয়।
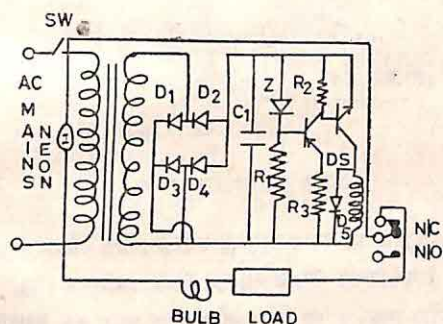
বেশী ভোল্টেজের ক্ষতি থেকে রেহাই

D_1—D_4 চারটি ডায়াডের সাহায্যে স্টেপ ডাউন ট্রানসফরমারের সেকেণ্ডারী ভোল-টেজকে রেকটিফাই করে C_1 কনডেনসার দিয়ে ফিলটার করা হয়েছে। R_1 রোধকে ঘুরিয়ে এমনভাবে সেট করতে হবে যেন সর্বোচ্চ অনুমোদিত ভোলটেজের বেলায় জেনারটি ফায়ার না করে, অথচ সেই ভোলটেজ সীমা অতিক্রান্ত হলেই যেন জেনার ফায়ার করে। যতক্ষণ পর্যন্ত জেনারটি ফায়ার না করবে ততক্ষণ T_1 ট্রানজিষ্টারটি সক্রিয় হবে না। ফলে রিলের N/C প্রান্তের মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় তড়িৎপ্রবাহ হয়ে লোডের ভোলটেজ সরবরাহ হতে থাকবে। কিন্তু যখন সেই নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রান্ত হয়ে জেনার ফায়ার করবে তখন T_1 এই ট্রানজিষ্টারটি সক্রিয় হবে, সঙ্গে সঙ্গে T_2 ট্রানজিষ্টরটিও সক্রিয় হয়ে রিলেকে সচল করবে। এর ফলে রিলেটির N/C প্রান্ত মুক্ত হয়ে N/O প্রান্তের সংযোগ ঘটবে। এর ফলে লোড এবং সাপ্লাই-এর মধ্যে তড়িৎ বিচ্ছেদ ঘটবে এবং বাড়তি ভোলটেজের আঘাত থেকে লোডকে বাঁচান সম্ভব হবে। লোড লাইনে একটি নির্দেশক

বাল্ব বসান থাকে যাতে চোখে দেখে ভোলটেজ অফ হওয়া বুঝতে পারা যায়। সার্কিটে D_3 এর প্রান্তটি ট্রান্সফর্মারের নিচের প্রান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন ধরতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ—

১। স্টেপ ডাউন ট্রানসফরমার 220/9V/500mA
২। ডায়োড D_1—D_4—BY 127
৩। কনডেনসার—C_1—1000 Mfd/25V ইলেকট্রোলিটিক
৪। জেনার Z—12V, 1W
৫। পোটেনসিওমিটার R_1—100K লিনিয়ার
৬। রেজিস্টর—R_2—2·2K, R_3—470Ω, $\frac{1}{2}$W
৭। রিলে 6 Volts, কয়েল রোধ 500Ω বা তার বেশী SPDT type
৮। ট্রানজিস্টর T_1—AC125/BC177, T_2—AC127

৯নং প্রজেক্ট

কনডেনসার পরীক্ষা করা

ইলেকট্রনিকসের কাজ করতে শুরু করলেই দেখা যাবে নানা ধরনের কনডেনসার ব্যবহার করতে হচ্ছে। এদের মধ্যে ইলেকট্রোলিটিক ধরনের কনডেনসারগুলো হামেশাই খারাপ হয়ে গিয়ে সার্কিটের স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটায়। মিটারের সাহায্যে এই ধরনের কনডেনসার পরীক্ষা করা যায়, কিন্তু হাতের কাছে ভাল মিটার না থাকলে এই পরীক্ষার কাজটি বেশ কঠিন। এমন ক্ষেত্রে একটি ছোট টেস্টার সার্কিট বানিয়ে নিলে কনডেনসার পরীক্ষার কাজটি সহজ হয়ে যাবে। এই সার্কিটটি নিচে দেখান হ'ল এবং এর কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
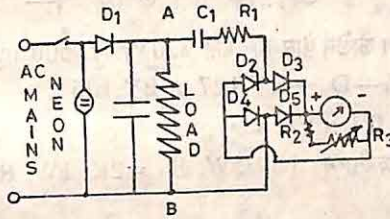
কনডেনসার পরীক্ষা করা

এসি মেইনস থেকে একটি স্টেপ ডাউন ট্রানসফরমার-এর সাহায্যে ভোল্টেজ কমিয়ে একটি ডায়োড D_1 এর সাহায্যে সেই ভোল্টেজকে রেকটিফাই করা হয়েছে। এই রেকটিফায়েড ভোল্টেজের এক অংশ শুদ্ধ ডিসি এবং অপর অংশ এসি। A বিন্দুতে কত খানি এসি বর্তমান থাকবে সেটি নির্ভর করবে A এবং B বিন্দুর মধ্যে কতটা কনডেনসার বসান আছে তার উপর। কারণ এই কনডেনসারটি এসি ফিলটারের কাজ করবে। এইবারে A এবং B বিন্দুর মধ্যে যে কোন একটি কনডেনসারকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে (যে কনডেনসারটি পরীক্ষা করা হবে)। A বিন্দুর বিভবকে C_1 এবং R_1-এর মধ্য দিয়ে D_2—D_5 এই ডায়োড ব্রীজের দুই প্রান্তে যুক্ত করা হয়েছে। C_1 কনডেনসারটি A বিন্দুর ডিসি ভোল্টেজকে আটকে দেবে।

কিন্তু এসি ভোল্টেজকে ব্রীজের প্রান্তে উপস্থিত হতে সাহায্য করবে। এইবারে এই ব্রীজটি সেই এসিকে রেকটিফাই করে ডিসি ভোল্টেজ তৈরি করবে। এই ডিসি ভোল্টেজকে একটি মাইক্রো অ্যামমিটারের সাহায্যে মাপার ব্যবস্থা করা আছে। মিটার টি যাতে পুড়ে না যায় তার জন্য এর দুই প্রান্তে একটি ছোট রোধ রাখা আছে, যার ভিতর

দিয়েই অধিকাংশ তড়িৎ প্রবাহিত হবে যার ফলে মিটারটি নষ্ট না হয়ে ঠিক ঠিক পাঠ দিতে পারে।

A এবং B বিন্দুর মধ্যে অবস্থিত কনডেনসারটি যত বেশী মাপের হবে, A, B বিন্দুর মধ্যে এসি ভোল্টেজের মান তত কম হবে এবং মাইক্রো অ্যামমিটারটি তত কম পাঠ দেবে। কিন্তু কোন কারণে কনডেনসারটি খারাপ হলে সেটি এসি ফিলটার করতে ব্যর্থ হবে এবং কারেণ্ট মিটারের পাঠও বেড়ে যাবে। একটি জানা মানের কনডেনসারকে বসিয়ে অ্যামমিটারটি ক্যালিব্রেট করে নিলে এর পাঠ থেকে অন্য যে কোন কনডেনসারের মানের ধারণা করাও সম্ভব।

এই সার্কিটের সফল ব্যবহারের জন্য এসি লাইন ভোল্টেজ কমা বাড়া করলে চলবে না। যেহেতু সাধারণ ক্ষেত্রে এই কমা বাড়া খুবই স্বাভাবিক ঘটনা, এই সার্কিটটির ব্যবসায়িক প্রয়োগের পূর্বে এর আরও উন্নতি করে নিতে হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ—

১। একটি স্টেপ ডাউন ট্রানসফরমার 220V/9V, 500 mA

২। ডায়োড D_1—D_5—BY 127 বা BY 125

৩। কনডেনসার 0·1 μF/25V

৪। লোড রেজিষ্ট্যান্স 10Ω/5W, $R_1 = 2K$, $\frac{1}{2}$W, $R_2 = 100\Omega$, $R_3 = 1K$ পোটেনসিওমিটার।

৫। O—100μA ফুল স্কেল মাইক্রো অ্যামমিটার।

১০নং প্রজেক্ট

ব্যাটারীর কম ভোল্টেজ বুঝতে পারা

ব্যাটারী দিয়ে কোন যন্ত্র চালিয়ে যেতে যেতে ব্যাটারীর ভোল্টেজ কমে যায়। কোন কোন যন্ত্রের বেলায় একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজের নিচে নেমে গেলে সেই যন্ত্রের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। মজা হল আমাদের অজান্তে এই অবস্থা হলে কিছু করার থাকে না। নিচের সার্কিটের সাহায্যে এমন ব্যবস্থা করা যায় যাতে ব্যাটারীর ভোল্টেজ কমতে কমতে অনুমোদিত সর্বনিম্ন মানের নিচে নামলেই একটি আলোর সঙ্কেত পাওয়া যাবে। পুরোনো ব্যাটারী ফেলে দিয়ে তখন নতুন ব্যাটারী লাগিয়ে দেবার ঝামেলাটুকু মেনে নিলে দামী যন্ত্রটি ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাবে।

এবারে দেখা যাক সার্কিটটি কেমন করে কাজ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাটারী B-এর ভোল্টেজ, জেনারটির ব্রেক ডাউন ভোল্টেজের বেশী থাকবে ততক্ষণ T_1 ট্রানজিস্টরের এমিটার E টার্মিনালে বেশ খানিকটা ধনাত্মক মান বর্তমান থাকবে। এইবারে R_2 পোটেনসিওমিটারকে ঘুরিয়ে এমন ভাবে সেট করতে হবে যেন T_1 ট্রানজিস্টরটি এই অবস্থায় সক্রিয় না হয়। এই সেটিং আবার এমন হবে যাতে E টার্মিনালের ভোল্টেজ সামান্য কমে গেলেই যেন T_1টি সক্রিয় হতে পারে। এবারে দেখা যাক B ব্যাটারীর ভোল্টেজ সর্বনিম্ন মানের (এ ক্ষেত্রে 5·6V) নিচে গেলে (যে ভোল্টেজটি জেনারের ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ দ্বারা সূচিত) কী হয়। যখন ব্যাটারীর ভোল্টেজ কমতে কমতে জেনারের ব্রেক ডাউন ভোল্টেজের নিচে নেমে যাবে, তখম জেনারটি ফায়ার করবে না। এর ফলে E টার্মিনালের ভোল্টেজ একেবারে কমে প্রায় শূন্য হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে T_1 ট্রানজিস্টার সক্রিয় হয়ে T_2 ট্রানজিস্টরকে সক্রিয় করবে এবং T_2-এর কালেকটার-এ যুক্ত LEDটি জ্বলে উঠবে। এটি নিঃশব্দ সংকেত। যদি কেউ দূর থেকে এই সঙ্কেতটি পেতে চায় তাহলে LED-এর পরিবর্তে একটি 6 Volt-এর রিলে বসিয়ে অ্যালার্ম বাজানর ব্যবস্থা করে নিলেই কাজ চলবে।
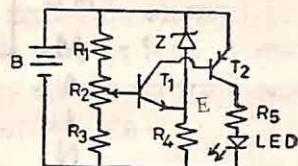
ব্যাটারীর কম ভোল্টেজ বুঝতে পারা

প্রয়োজনীয় উপকরণ—

১। ট্রানজিস্টর T_1—BC—149, T_2—AC128

২। ডায়োড BY125

৩। জেনার ESZ—5·6 বা 1Z 5·6A

৪। রেজিস্টর R_1—4·7K, R_2—10K পোটেনসিওমিটার, R_3—4·7K, R_4—3·3K, R_5—200Ω

৫। LED—১টি/6V রিলে ১টি

৬। তার, সলডার তার ইত্যাদি।

১১নং প্রজেক্ট

ফিউজ কেটে গেলে বুঝতে পারা

মেইন লাইনে পাওয়ার রয়েছে কিন্তু আলো জ্বলছে না। একাধিক কারণে এমন অবস্থা হওয়া সম্ভব। একটি হচ্ছে মেইনসের ফিউজ তারটি কেটে গেছে। কারণটি খুঁজতে এদিক ওদিক হাতড়ে বেড়াবার দরকার হবে না যদি সামান্য খরচ করে নিচের সার্কিটটি বানিয়ে ঠিকভাবে লাগিয়ে নেওয়া যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় যে নিওন আলোটি একটানা আলো দেবে, ফিউজ কেটে গেলে সেটি দপ্ দপ্ করে জ্বলবে। এবারে দেখা যাক কেমন করে সার্কিটটি কাজ করে।
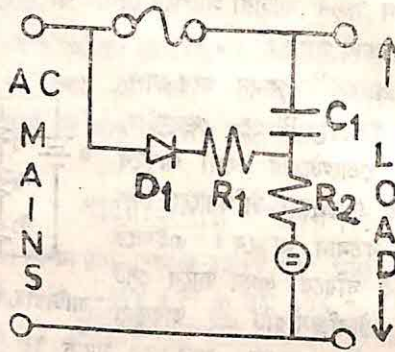
ফিউজ কেটে গেলে বুঝতে পারা

যতক্ষণ ফিউজটি ঠিক থাকবে ততক্ষণ মেইন লাইনের পাওয়ার C_1 কনডেনসারের মধ্য দিয়ে নিওন বাতিকে জ্বালিয়ে রাখবে। যখন কোন কারণে ফিউজ তারটি কেটে যাবে তখন D_1 ডায়োড এসি ভোল্টেজকে রেকটিফাই করে C_1 কনডেনসারকে লোডের মধ্য দিয়ে চার্জ করবে। যখন C_1-এর ভোল্টেজ নিওন বাতির ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ অপেক্ষা বেশী হবে তখন নিয়ন বাতিটি জ্বলে উঠবে। মজা হ'ল নিওনটি জ্বলবার সাথে সাথে C_1 কনডেনসারটি ডিসচার্জ হয়ে যাবে এবং নিয়ন বাতিটি নিভে যাবে। এবারে আবার C_1টি চার্জ হবে এবং একই ভাবে কিছু পরে ডিসচার্জ হবে। এই পর্যায়ক্রমিক চার্জ ও ডিসচার্জ হবার সাথে সাথে নিয়ন বাতিটি নিভবে এবং জ্বলবে অর্থাৎ দপ্ দপ্ করবে।

বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থা কেবল এসি সাপ্লাই-এর বেলায় কার্যকরী হবে। ছবিতে দেখান R_2 রোধ সাধারণত বাজারের নিওন বাতির সাথে জুড়ে এক সাথে বিক্রি হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ—

১। ডায়োড—BY 127
২। কনডেনসার—0·5 μF 500V পেপার কনডেনসার।
৩। রেজিস্টর—R_1—1MΩ, R_2—100K
৪। নিয়ন বাতি, তার, সলডার তার ইত্যাদি।

U. J. T., F. E. T., S. C. R. প্রোজেক্ট

এ পর্যন্ত যে কটি প্রজেক্ট-এর বিষয়ে বলা হয়েছে সেগুলি তৈরি করার জন্য সক্রিয় উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে শুধু ট্রানজিস্টরকে। কিন্তু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ইউনিজাংশন ট্রানজিস্টার (UJT), ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টার (FET), সিলিকন কণ্ট্রোল্ড রেকটিফায়ার (SCR) এই যন্ত্র গুলোও বহু ব্যবহৃত সক্রীয় যন্ত্র। এছাড়া রয়েছে ডায়াক, ট্রায়াক, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট প্রভৃতি। প্রজেক্ট তৈরিতে হাত পাকাতে গেলে শুধু ট্রানজিস্টর ব্যবহার করে সেটি সম্ভব নয়। অবশ্য একথা ঠিক, বুদ্ধি খাটিয়ে শুধু ট্রানজিস্টর ব্যবহার করে অসংখ্য প্রজেক্ট তৈরি করা সম্ভব।

এবারে আমরা UJT, FET এবং SCR দিয়ে তৈরি প্রজেক্ট এর বিষয়ে আলোচনা করব। যেহেতু এদের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আগেই কিছু আলোচনা করা হয়েছে এখানে তার পুনরুল্লেখ না করে শুধু ব্যবহার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হ'ল।

টাইমার সার্কিট

টাইমার সার্কিট ব্যবহার করে বহু মূল্যবান প্রজেক্ট তৈরি করা সম্ভব। টাইমার সার্কিট-এর কাজ হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে অন্য একটি সার্কিটকে অন করা অথবা অফ করা। এই পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ের মান খুব কম যেমন কয়েক মিলি সেকেণ্ড থেকে কয়েক মিনিট বা ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে। এই সার্কিটগুলোর কাজ করার মূলে থাকে একটি R—C নেটওয়ার্ক। আমরা জানি কোন একটি কনডেনসারকে যদি একটি রোধের মধ্য দিয়ে একটি সাপ্লাই-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয় তাহলে ওই কনডেনসারটি আস্তে আস্তে ওই সাপ্লাই ভোল্টেজ-এর মান ধারণ করে। সার্কিট বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখা গেছে যে কোন সাপ্লাই ভোল্টেজ-এর প্রায় 63% মান ধারণ করতে সময় লাগে $R\times C$ সেকেণ্ড, যেখানে R-এর মান রোধে এবং C-এর মান ফ্যারাডের এককে বসিয়ে ওই গুণফলটি সারতে হবে। একটি উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যকে আরও সরল করা যাক। একটি কনডেনসার-এর মান $C=100\mu F$। এটিকে একটি রোধ $R=100\Omega$ এর সহিত যুক্ত করে 9V সাপ্লাই ভোল্টেজ-এর সঙ্গে যুক্ত করা হল।

এক্ষেত্রে 9V-এর $63\% = \frac{9\times 63}{100}V = 5.67V$

$R\times C = 100\times 100\times 10^{-6}$ সেকেণ্ড $= 10^{-2}$ সেকেণ্ড $= 10^{3}\times 10^{-2}$
$= 10$ মিলিসেকেণ্ড

R-এর মান 100Ω কিন্তু C-এর মান $100\mu F = {}^{\cdot}00\times 10^{-6}$ ফ্যারাড বসিয়ে 10^{-2} সেকেণ্ড পাওয়া গেছে। এই সংখ্যাটিকে $10^{3}=1000$ দিয়ে গুণ করে 10 মিলি সেকেণ্ড পাওয়া গেল। এই উদাহরণের সাহায্যে বুঝা গেল যে সুইচ অন করার 10 মিলি সেকেণ্ড বাদে C-এর ভোল্টেজ 5·67 Volt পাওয়া যাবে। এই সময়ের মানকে সহজেই বাড়ান সম্ভব যদি R অথবা C অথবা উভয়কেই অনেক বেশী

করা যায়। যেমন $R=1M=10^6\Omega$ এবং $C=1000\mu F=1000\times10^{-6}$ ফ্যারাড হলে ওই একই পরিমান বিভব (অর্থাৎ 5·67V) পাওয়া যাবে $RC=10^6\times1000\times10^{-6}$ সেকেণ্ড $=1000$ সেকেণ্ড বাদে। অর্থাৎ একই বিভব পাবার সময় 10 মিলি সেকেণ্ড থেকে বেড়ে দাঁড়াল 1000 সেকেণ্ড বা প্রায় 16 মিনিট।

U. J. T.-র ক্রিয়া ঃ এবারে দেখা যাক A বিন্দুতে যে বিভব পাওয়া গেল সেটিকে কাজে লাগিয়ে কেমন করে একটি UJT কে অন করা যায়। এই সার্কিটের সংযোগটি নিচের ছবিতে দেখান হয়েছে।
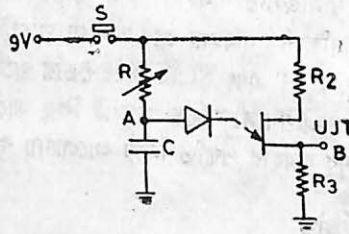
UJT ফায়ারিং সার্কিট

UJT কে যেভাবে সার্কিটে লাগান হয়েছে তাতে সুইচ S কে অন করলে সঙ্গে সঙ্গেই সেটি ফায়ার করবে না অর্থাৎ UJT টি অন হবে না। R_2 এবং R_3-এর মানের উপর নির্ভর করে A বিন্দুতে একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজ থাকলে তবেই সেটি ফায়ার করবে। মনে করা যাক R_2 এবং R_3 এমনভাবে ঠিক করা হল যাতে A বিন্দুতে 5 ভোল্ট হলেই UJT ফায়ার করবে। যদি সার্কিটের প্রয়োজন মেটাতে এই ভোল্টেজ 10 সেকেণ্ড বাদে আসা দরকার হয় তাহলে R-এর মান এমনভাবে সেট করতে হবে যেন ঠিক 10 সেকেণ্ড বাদে A বিন্দুতে 5 ভোল্ট পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যদি আরও কম সময়ের মধ্যে A বিন্দুতে 5 ভোল্ট পাওয়া প্রয়োজন হয় তাহলে R-এর মান কমিয়ে কমিয়ে এমনভাবে সেট করতে হবে যেন সেই নির্দিষ্ট সময় পরেই A বিন্দুর বিভব 5 ভোল্ট হয়। সুইচ S টিপ্‌বার যে সময় পরে UJT ফায়ার করবে সেই সময়কে বলা হয় delay বা দেরি। আগেই বলা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই delay-র মান বিভিন্ন। তবে খুব বেশী delay পাবার জন্য R-এর মান যথেচ্ছভাবে বাড়িয়ে গেলে UJT ফায়ার করার প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন তড়িৎ প্রবাহ ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে C-এর মানকে বাড়িয়ে কাজ করা উচিৎ। আবার C-এর মান সময়ের সঙ্গে যাতে পরিবর্তিত না হয় সেদিকে নজর রেখে চলতে হবে। ট্যাণ্টালাম জাতীয় কনডেনসার ব্যবহার করলে এই সমস্যা কম হবে কিন্তু বেশী মানের ট্যাণ্টালাম জাতীয় কনডেনসার না পেলে ইলেক্ট্রোলাইটিক বা পেপার কনডেনসার দিয়ে কাজ চালাতে হবে।

এবার দেখা যাক UJT ফায়ার করলে কী অবস্থা দাঁড়ায়। যখন UJT ফায়ার করবে তখন কনডেনসারটি R_3 রোধের মধ্য দিয়ে ডিসচার্জ করে তড়িৎমুক্ত হবে। R_3-এর মান সাধারণতঃ 100Ω এর কাছাকাছি রাখা থাকে, ফলে তড়িৎ মুক্তির জন্য

বেশী সময় লাগে না। যখন এই তড়িৎ মুক্তির ব্যাপারটি চলতে থাকবে তখন B বিন্দুতে একটি পালস্ পাওয়া যাবে।

S. C. R.-এর ব্যবহার পদ্ধতি ঃ এবারে এই পালস্ টিকে কাজে লাগিয়ে একটি SCR কে কেমন করে সচল করা যায় তা বলা হচ্ছে। SCR-এর সংযোজনটি নিচের ছবিতে দেখান হল।
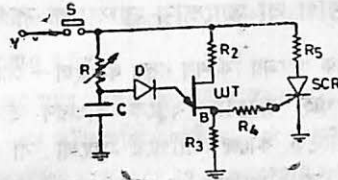
SCR অন করার সার্কিট

যতক্ষণ পর্যন্ত B বিন্দুতে কোন ভোল্টেজ না থাকে ততক্ষণ SCRটি অফ অবস্থায় থাকবে। যখন সুইচ টিপে S কে অন করে দেওয়া হয়, তখন পূর্বনির্দিষ্ট সময় পরে UJT ফায়ার করবে (আগেই সেটি বুঝিয়ে বলা হয়েছে) এবং B বিন্দুতে একটি ভোল্টেজ পালস্ তৈরি হবে। এই পালস্‌টি একটি রোধ R_4-এর সাহায্যে SCR-এর গেট এর সঙ্গে যুক্ত করা আছে। এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে SCRটি অন হবে এবং সাপ্লাই ভোল্টেজ থেকে রোধ R_5-এর মধ্য দিয়ে SCR বরাবর তড়িৎ প্রবাহ হতে থাকবে। যদি R_5 একটি আলোর বাল্ব হয় তবে সেই প্রবাহে এটি আলোর উৎস হিসেবে কাজ করতে পারবে,আবার যদি এটি একটি হিটারের কয়েল হয় তবে সেটি গরম হয়ে তাপের উৎস হিসেবে কাজ করবে। কখনও কখনও R_5 একটি মোটরও হতে পারে। তেমন ক্ষেত্রে মোটরটি ঘুরতে থাকবে। যাই হোক এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে কোন একটি সার্কিটকে অন করার জন্য একটি মাত্র UJT এবং একটি SCR ব্যবহার করলেই চলবে। SCR সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা দরকার। গেট টার্মিনালে পালস্ দিয়ে SCRকে একবার অন করে দেবার পর গেট-এর আর কোন ভূমিকা থাকে না। SCRকে অফ করার প্রয়োজন হলে এটির ক্যাথোড টার্মিনালকে অ্যানোড টার্মিনালের সাপেক্ষে ধনাত্মক বিভবযুক্ত হতে হবে। অতএব SCR-এর অ্যানোড এবং ক্যাথোড প্রান্তের মধ্যে এসি ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে একটি cycle-এর অর্দ্ধেক সময় পরে SCRটি আপনা আপনি অফ হয়ে যাবে। এবারে দেখা যাক এই পদ্ধতি ব্যবহার করে কেমন করে দু' একটি প্রজেক্ট সম্পূর্ণ করা যায়।

এ পর্যন্ত যে কয়টি প্রজেক্টের বিষয়ে বলা হয়েছে, সেগুলো মূলতঃ ট্রানজিস্টর নির্ভর। এই বই-এর পরিসরে অন্য কোন সক্রিয় উপকরণ যেমন FET, SCR, diac বা triacকে ব্যবহার করে প্রজেক্ট তৈরীর পরিকল্পনা নেই, তবু আগের আলোচনায় SCRকে কেমন করে ফায়ার করা যায় এবং কেমন ধরনের কাজে লাগান সম্ভব তার বিষয়ে কিছু বলা হয়েছে। এবারে আমরা UJT-কে কাজে লাগিয়ে দুটি প্রজেক্ট তৈরীর পরিকল্পনা বিষয়ে বলছি।

১২নং প্রজেক্ট

তাপ বা আলোর কম্পাঙ্কে রূপান্তর

আমরা দেখেছি এক ধরনের বিশেষ বস্তুর ধর্ম হল—আলো বা তাপের প্রভাবে তার রোধের পরিবর্তন। এই জাতীয় বস্তুকে সাধারণ ভাবে থার্মিস্টার বা Ldr বলা হয়। নিচের সার্কিটটিকে কাজে লাগিয়ে আলো বা তাপের মাত্রাকে ইলেট্রিক্যাল সিগন্যালের কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকোয়েন্সি-তে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এর সুবিধে হল কম্পাঙ্ক মাপার সূক্ষ্ম যন্ত্র হাতের কাছে থাকলে সহজেই ঐ আলো বা তাপের মাত্রাকে নিখুঁতভাবে মাপা সম্ভব। এছাড়া অন্য অনেক সুবিধে আছে। যেমন অ্যানালগ থেকে ডিজিটালে রূপান্তর করার একটি সহজ পদ্ধতি হিসেবে এর ব্যবহার। এবারে দেখা যাক্ সার্কিটটি কেমন করে কাজ করে।
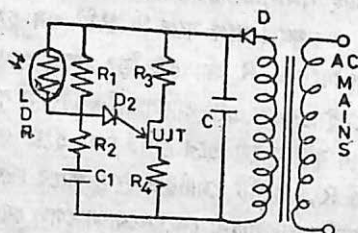
তাপ বা আলোর কম্পাঙ্কে রূপান্তর

Ldrটি রাখা হয়েছে R_1 রোধের সমান্তরালে। যখন আলো বা তাপ Ldr-এর উপরে পড়বে তখন তার রোধ কমবে এবং R_1 ও Ldr-এর মিলিত রোধ অনেক কম হবে। (রোধের সমান্তরাল সংযোগের বেলায় এমনই হয়ে থাকে)। সাপ্লাই ভোল্টেজ থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে C_1 কত দ্রুত বা আস্তে চার্জড হবে তা নির্ভর করে উপরিউক্ত রোধের পরিমাণের উপর। একটি বিশেষ মানের রোধের জন্য এই সময়টি নির্দিষ্ট (পূর্বের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। যখন C_1 চার্জড হয়ে UJT-র এমিটারের তুলনায় অধিক ভোল্টেজ প্রাপ্ত হবে তখন UJTটি ফায়ার করবে। এর ফলে C_1 কনডেনসারটি R_4 রোধের ভিতর দিয়ে তড়িৎমুক্ত (discharge) হতে থাকবে। R_4 এর রোধ বেশ কম রাখা হয়, ফলে তড়িৎমুক্তির জন্য বেশী সময় লাগে না। সম্পূর্ণ তড়িৎ মুক্ত হয়ে গেলে C_1 পুনরায় একটি গতিতে চার্জ সংগ্রহ করবে এবং একই নির্দিষ্ট সময় পরে এমিটার টার্মিনাল সাপেক্ষে বেশী ভোল্টেজ প্রাপ্ত হবে। সঙ্গে সঙ্গে UJT ফায়ার করবে এবং C_1 তড়িৎমুক্ত হবে। দেখা যাচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর C_1 চার্জড হয়ে তরিৎমুক্ত হতে থাকবে। একবার তড়িৎযুক্ত হয়ে তড়িৎমুক্ত হতে যে

সময় লাগে তাকে টাইম পিরিয়ড বলা হয়। যদি এই সময় T সেকেণ্ড হয় তাহলে ১সেকেণ্ডে মোট (1/T) বার C_1 কনডেনসারটি তড়িৎযুক্ত ও তড়িৎমুক্ত হতে পারবে। এই সংখ্যাকে বলা হয় কম্পাঙ্ক। R_4 রোধের উপর এই ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল, যাহার কম্পাঙ্ক (1/T), মাপতে পারা যায়। C_1-এর মানকে সঠিক ভাবে নির্বাচন করে এই কম্পাঙ্ককেএমন সীমার মধ্যে আনা সম্ভব যখন একটি ইয়ারফোনকে যুক্ত করে শব্দ শুনে কম্পাঙ্কের ধারণা করাও সম্ভব।

যখন আলো বা তাপের মাত্রা কমবে বা বাড়বে তখন Ldr-এর রোধ যথাক্রমে বাড়বে বা কমবে। ফলে C_1-এর তড়িৎযুক্তি ও তড়িৎমুক্তির সময় (যাহা $C_1 \times$ রোধ এই মান দ্বারা নির্দিষ্ট হয়) পরিবর্তিত হবে এবং কম্পাঙ্কের মান কমা বাড়া করবে। অতএব দেখা যাচ্ছে, এই সার্কিটটিকে একটি ডিজিটাল থার্মোমিটার বা ফোটোমিটার হিসেবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা আছে।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন—সাপ্লাই ভোল্টেজ স্থির থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়, C_1-এর মান স্থির থাকতে হবে। D_2-এর ব্যবহার ঐচ্ছিক।

প্রয়োজনীয় উপকরণ—

১। Ldr একটি
২। UJT একটি
৩। রোধ $R_1 = 1K$, $R_2 = 2K$, $R_3 = 560\Omega$, $R_4 = 100\Omega$
৪। কনডেনসার $C_1 - 0{\cdot}1\mu F$
৫। স্টেপডাউন ট্রানসফর্মার 230V/9V, 500 mA
৬। ডায়োডস্ D, D_2—BY 125

১৩নং প্রজেক্ট

টাইম ডিলে সার্কিট

বহু বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে একটি যন্ত্রকে চালাবার একটি নির্দিষ্ট সময় পরে অন্য একটি যন্ত্রকে চালান দরকার। দুটি যন্ত্রকে একই সঙ্গে চালান উচিত নয়। এমন সব ক্ষেত্রে আমরা ডিলে সার্কিট ব্যবহার করে থাকি। এই ডিলে সার্কিট নানাভাবে বানান সম্ভব। এখানে একটি মাত্র **UJT** ব্যবহার করে একটি চমৎকার ডিলে সার্কিট বানাবার পদ্ধতি বলা হয়েছে। এই সার্কিটের একটি মাত্র রোধ অথবা কনডেনসারকে এবং ক্ষেত্র বিশেষে উভয়কেই পরিবর্তন করে বিভিন্ন সময় সীমার ডিলে পাওয়া খুবই সহজ। এবারে সার্কিটটি এবং তার কার্যপদ্ধতির বিষয় বলা যাক্।
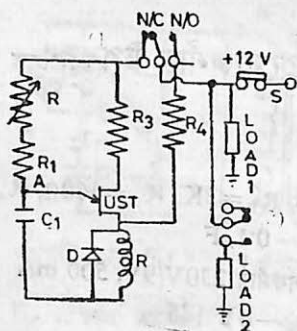
টাইম ডিলে সার্কিট

রোধ **R**কে ঘুরিয়ে এমনভাবে সেট করা হয় যেন প্রয়োজনীয় সময়টুকু পার হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে **A** বিন্দুর ভোল্টেজ এমন মাত্রায় আসে যে **UJT**টি ফায়ার করতে পারে। এই সময়টি R, R_1-এর যোগফলের সাথে C_1-এর গুণফল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—একথা আগেই বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। যখন **UJT** টি ফায়ার করবে তখন সেই তড়িৎ প্রবাহে রিলেটি সচল হবে। রিলেটির **(1)** চিহ্নিত সংযোগ স্থলের দিকে তাকালে সহজেই বোঝা যাবে যে **R**-এর সঙ্গে 12 ভোল্ট সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন হবে এবং এই সাপ্লাই থেকে R_4 বরাবর তড়িৎ সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হবার সুবাদে রিলেটি সচলই থাকবে। এবারে এই রিলেটির (2) চিহ্নিত সংযোগ স্থলের দিকে তাকালে বোঝা যাবে যে রিলেটি যতক্ষণ অচল ছিল, ততক্ষণ **২**নং লোড-এ কোন তড়িৎ প্রবাহ ঘটেনি, কিন্তু যে মুহূর্তে রিলেটি অন হয়েছে সেই সময় থেকে ২নং লোড-এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ

প্রবাহ নিশ্চিত হয়েছে। এর থেকে বোঝা গেল সুইচ S টিপবার সাথে সাথে লোড 1 এ তড়িৎ প্রবাহ ঘটছে, কিন্তু ডিলে সার্কিট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সময় পরে লোড 2-এ তড়িৎ প্রবাহ ঘটবে। লোড 2-এর সঙ্গে এসি মেইনস যুক্ত করেও (সেক্ষেত্রে 12 ভোল্ট সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করে নিতে হবে) লোড-এর প্রবাহ বজায় রাখার ব্যবস্থা করা যায়। বস্তুতঃপক্ষে এই সার্কিটের কার্যপদ্ধতি সঠিকভাবে অনুধাবন করে ডিলে সংক্রান্ত নানা ক্ষেত্রে এর সফল প্রয়োগ সম্ভব।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। R—500k পোটেনসিওমিটার
R_1—2K, $R_3 = 560\Omega$, $R_4 = 100\Omega$

২। কনডেনসার C_1—100μF থেকে 1000μF এর যে কোন মান

৩। UJT একটি

৪। Relay একটি

৫। D—BY125

৬। 12 V. supply/Battery eliminator।

১৪নং প্রজেক্ট

পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম

যে কোন রকমের ইলেক্ট্রনিক কাজকর্মের জন্যই চাই একটি ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম। অনেক সময় একটি বা একাধিক ব্যাটারীর সাহায্যে এই প্রয়োজন মেটান হয়। কিন্তু এসি মেইন্‌স থেকে ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে ভোল্টেজ কমিয়ে বাড়িয়ে রেক্টিফায়ার দিয়ে ডিসি করে নেবার চল অনেক বেশী এবং এর অনেক বাড়তি সুবিধেও আছে। তাই সংক্ষেপে হলেও এই পদ্ধতিতে পাওয়ার সাপ্লাই তৈরি করার বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত।

এবারে দেখা যাক্ একটি ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম তৈরি করতে গেলে কোন্ মৌলিক কথাগুলো মাথায় রেখে এগোতে হবে। এই কথাগুলো পরপর সাজিয়ে নিয়ে চিন্তা করলে কাজটি অনেক সহজ ও সুন্দর হবে।

১। ডিসি সাপ্লাই ভোল্টেজ কত হতে হবে।

২। সাপ্লাই সিস্টেম থেকে কত কারেণ্ট নেওয়া হবে।

৩। সাপ্লাই সিস্টেমের রিপ্‌ল্ (অর্থাৎ মিশ্রিত এসির অংশ) সর্বাধিক কত গ্রহণযোগ্য।

৪। ভোল্টেজ কত বেশী স্টেব্‌ল (stable) হতে হবে।

৫। স্টেবল্ ভোল্টেজ না স্টেবল্ কারেণ্ট—কোন্‌টি বেশী জরুরী।

৬। স্থির ভোল্টেজ না পরিবর্তনযোগ্য (variable) ভোল্টেজ চাই।

৭। কী ধরণের প্রোটেক্‌শন থাকা দরকার।

উপরের লেখা প্রশ্নগুলো ছাড়াও একটি ভাল জাতের ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম বানাতে গেলে আরও অনেক বিষয় ভাবতে হয়। তবে মোটামুটি ধরনের কাজ চালাবার জন্য এই বিষয়গুলোই যথেষ্ট।

কোন পাওয়ার সাপ্লাই তৈরি করতে হলে কী কী বিষয় মাথায় রেখে এগোতে হবে সেগুলো আমরা দেখে নিলাম। এবারে দেখা যাক বাস্তব ক্ষেত্রে এগুলোকে কেমন করে প্রয়োগ করতে হবে।

যে কোন পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটে সাধারণতঃ তিনটি মূল অংশ থাকে। প্রথম অংশটি হচ্ছে রেকটিফিকেশন অর্থাৎ দ্বিমুখী বিভবকে একমুখী বিভবে পরিণত করার ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় অংশে থাকে ফিলটার। এই ফিলটার অংশটির কাজ হচ্ছে রেকটিফায়েড ভোল্টেজের এসি অংশকে কমিয়ে দিয়ে শুদ্ধ ডিসি সরবরাহ করা।

তৃতীয় এবং শেষ অংশে থাকে রেগুলেশন এবং স্টেবিলাইজেশনের ব্যবস্থা। এই

অংশের কাজ হ'ল প্রয়োজন মাফিক আউটপুট ভোল্টেজকে কমান বা বাড়ান এবং তাকে যথাসম্ভব স্থির রাখা অর্থাৎ স্টেবিলাইজেশন।

এখানে বলে রাখা ভাল সমস্ত ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটেই যে এই তিনটি অংশ থাকবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কোন কোন ইউনিটে শেষের অংশটি নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে সাপ্লাইটির আউটপুট ভোল্টেজ ততটা স্থির থাকবে না এবং সেটিকে কমান বা বাড়ানও সম্ভব হবে না।

এবারে এই তিনটি মূল অংশের প্রত্যেকটি সম্পর্কে দু'চার কথা বলা যাক।

রেক্টিফিকেশন ঃ

এই কাজটি করার জন্য আমরা একটি, দুটি বা চারটি ডায়োডকে ব্যবহার করতে পারি। একটি মাত্র ডায়োড ব্যবহার করে যে রেক্টিফিকেশন করা হয় তাকে বলা হয় হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশন। বাস্তব ক্ষেত্রে এর ব্যবহার খুবই কম।

দুটি ডায়োড ব্যবহার করে আমরা ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশন পেয়ে থাকি। এই ব্যবস্থায় ইনপুটের বিপরীতমুখী দুটি হাফ ওয়েভকে ডিসি ভোল্টোজে রূপান্তর করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে আউট পুট ডিসির মান প্রথমটির তুলনায় দ্বিগুণ।

এই একই কাজ আর একটি পদ্ধতিতে করা যায় যেখানে মোট চারটি ডায়োডকে ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে রেক্টিফিকেশনের নাম হ'ল ব্রীজ রেক্টিফিকেশন। আমরা এই তিনটি পদ্ধতিকে নিচের ছবির সাহায্যে আরও পরিষ্কার করে বুঝতে পারব।
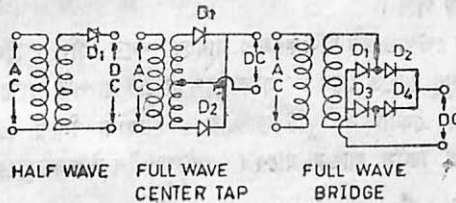
রেক্টিফিকেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি

এবারে আসা যাক ফিল্টার প্রসঙ্গে। ফিল্টার নানা ধরনের হতে পারে। যেমন শুধু একটি চোক্ কয়েল ব্যবহার করে রেক্টিফায়েড আউটপুট ভোল্টেজ থেকে এসি ভোল্টেজ অংশকে বেশ খানিকটা কমিয়ে দেওয়া সম্ভব। আবার এই একই কাজ একটি বা একাধিক কনডেনসারকে আউটপুট ভোল্টেজের সমান্তরালে ব্যবহার করেও সুনিশ্চিত করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে চোক্ কয়েল কে সিরিজে যোগ করে এবং কনডেনসারকে সমান্তরালে যোগ করে ফিল্টার করার কাজটি সারা হয়। এই ফিল্টার সার্কিটে চোক কয়েলের যত বেশী ইনডাক্ট্যান্স এবং কনডেনসারের যত বেশী ক্যাপাসিটান্স হবে, ফিল্টারিং এর কাজটিও তত ভাল হবে। অবশ্য উচ্চ কম্পাঙ্কের এসি ভোল্টেজকে তাড়িয়ে দেবার জন্য এই মান খুব বেশী না হলেও চলে।

এবারে আসা যাক্ শেষ অংশের আলোচনায়। আমরা প্রথমেই দেখব কেমন করে

একটি পরিবর্তনশীল ডিসি ভোল্টেজকে একটি স্থির ডিসিতে পরিণত করা সম্ভব। এই কাজটি খুব সহজেই করা যাবে একটি জেনার ডায়োডকে আউটপুটে ব্যবহার করে। আমরা যে স্থির ডিসি ভোল্টেজ পেতে চাই সেটি আগে ঠিক করে নিতে হবে। এবারে, এমন একটি জেনার ডায়োড খুঁজে নিয়ে আউট পুটের সমান্তরালে বসিয়ে দেব যার ব্রেকডাউন ভোল্টেজ ওই নির্দিষ্ট স্থির ডিসি ভোল্টেজের সমান। অবশ্য এই সংযোগের সময় একটি রোধকে আউটপুট ভোল্টেজের সিরিজে ব্যবহার করতে হবে। আরও একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যেন রেক্টিফায়েড আউটপুট ভোল্টেজের মান জেনার ব্রেকডাউন ভোল্টেজের চেয়ে বেশী থাকে। কেমন করে জেনার ডায়োডকে ব্যবহার করে ভোল্টেজ স্থিরিকরণের কাজটি করা হয় সেটি নিচের ছবিটি দেখলেই বোঝা যাবে।
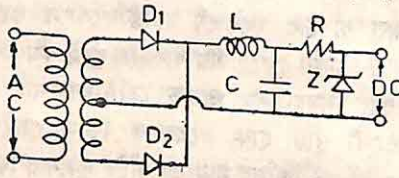
জেনারের ব্যবহার

এবারে দেখা যাক্ কেমন করে হাতে কলমে একটি পাওয়ার সাপ্লাই বানান যাবে। মনে করা যাক্ একটি কম ভোল্টেজের ডিসি সাপ্লাই বানাতে চাই যেটি থেকে আমরা পরিবর্তনযোগ্য ভোল্টেজ পাব।

বলা বাহুল্য একটি স্টেপডাউন ট্রান্সফরমার ব্যবহার করে এসি মেইন্স্ ভোল্টেজকে কমিয়ে নিয়ে কাজটি শুরু করতে হবে। যদি রিপ্‌ল-এর ব্যাপার নিয়ে খুব বেশী মাথা না ঘামাতে হয় তাহলে একটি বা দুটি ডায়োডের সাহায্য নিয়ে এসি ভোল্টেজকে রেক্টিফাই করে নিলেই ডিসি পাওয়া যাবে। স্টেপডাউন ট্রান্সফরমারের সেকেণ্ডারীতে
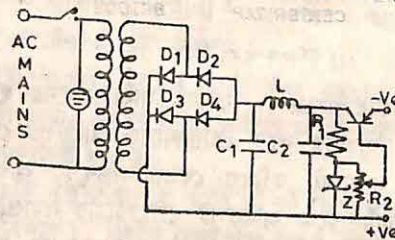
পরিবর্তনযোগ্য ডিসি সাপ্লাই

পরিবর্তনযোগ্য এসি ভোল্টেজ পাবার ব্যবস্থা রাখলে একটি সিলেক্টর (selector) সুইচ ব্যবহার করলেই আমাদের প্রয়োজন মিটে যাবে। কিন্তু রিপ্‌ল কম রেখে অবিচ্ছিন্ন ভাবে (continuously) পরিবর্তনযোগ্য ডিসি ভোল্টেজ পাবার প্রয়োজন মেটাতে উপরের পদ্ধতিটি যথেষ্ট নয়। নীচের সার্কিটের সাহায্যে পাওয়ার সাপ্লাইটি বানিয়ে নিলে সেই প্রয়োজন মিটবে।

এবারে দেখা যাক্ সার্কিটটি কেমন করে কাজ করে। ষ্টেপডাউন ট্রান্সফরমারটি এসি মেইন্‌স্ ভোল্টেজকে কমিয়ে দেয়। চারটি ডায়োডের সাহায্য নিয়ে এই এসি ভোল্টেজকে রেক্টিফাই করে ডিসি করা হয়েছে। দুটি কনডেনসার ও একটি চোকের সাহায্য নিয়ে মিশ্রিত এসি অংশকে কমিয়ে ফেলে রিপ্‌লের মান কমান হয়েছে। বলা বাহুল্য এই কাজটির নাম হচ্ছে ফিল্টারিং (filtering)। কনডেনসার এবং চোকের মান যত বেশী হবে, ফিলটারিং-এর কাজটিও ততই সুন্দর হবে, অর্থাৎ রিপ্‌ল (ripple) তত কম হবে। এবারে আসা যাক্ জেনার ডায়োড অংশে। ডিসি ভোল্টেজ-এর মান নির্বাচিত ডায়োডের ব্রেকডাউন ভোল্টেজের (breakdown voltage) বেশী হলে জেনার ডায়োডটি ফায়ার করবে এবং জেনার ডায়োডের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ একটি নির্দিষ্ট মানে স্থির থাকবে। এবারে দেখা যাক্ ট্রানজিস্টরটি কী কাজ করে। জেনারের দুই প্রান্তের স্থির ভোল্টেজকে কাজে লাগিয়ে ট্রানজিস্টরের বেসের কারেণ্ট প্রবাহ কমান বা বাড়ান হয়। বেসের প্রবাহের উপর নির্ভর করবে ট্রানজিস্টরের কালেক্টর এবং এমিটার প্রান্তের মধ্যে ভোল্টেজ (V_{CE}) কতটা হবে। বেস প্রবাহ কমালে V_{CE} বাড়বে এবং বেস প্রবাহ বাড়ালে V_{CE} কমবে। ট্রানজিস্টরের কালেক্টর প্রান্তে যতটা ডিসি ভোল্টেজ থাকবে তার থেকে এমিটারে কম ডিসি ভোল্টেজ থাকবে, আর এই কমের পরিমাণ নির্ভর করবে বেসের প্রবাহ তথা পোটেনসিওমিটারের সেটিং এর উপর।

অতএব দেখা গেল এই সার্কিটটির সাহায্যে সহজেই অনেক কম রিপ্‌লের পরিবর্তনযোগ্য ডিসি ভোল্টেজ পাওয়া যাবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ—

১। একটি ষ্টেপডাউন ট্রান্সফরমার

২। ডায়োড D_1—D_4—BY125

৩। জেনার ডায়োড ESZ4.7 বা ESZ5·1

৪। ট্রানজিস্টর T_1—AD149

৫। কনডেনসার C_1, C_2—500μF, 100 volt, ইলেক্‌ট্রোলিটিক

৬। চোক –L_1—0·05 হেনরি, 1 amp.

৭। R_1—200Ω, R_2—10K লিনিয়ার পোটেনশিওমিটার

৮। সুইচ, নিয়ন, বোর্ড, সলডার, তার ইত্যাদি।

বিঃ দ্রষ্টব্য ঃ AD149-এর বদলে 2N3055 ব্যবহার করেও সাপ্লাইটি তৈরি করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে প্রান্তগুলোর সংযোগ আলাদা হবে কারণ AD149 হল PNP ধরনের এবং 2N3055 হচ্ছে NPN ধরনের।

১৫ নং প্রজেক্ট

তরলের তল নির্দেশক সার্কিট

আগের একটি প্রজেক্টে আমরা দেখেছি কেমন করে জলের ট্যাঙ্ক ভর্তি হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যালার্ম বাজার ব্যবস্থা করা যায়। এখানে আমরা একটি বিপরীত অবস্থা নির্দেশক সার্কিট তৈরি করতে চাই। অর্থাৎ সার্কিটটি এমন হবে যাতে একটি নির্দিষ্ট তলের নিচে তরল পদার্থটি নেমে গেলেই অ্যালার্ম বেজে উঠবে। বাস্তব ক্ষেত্রে এমন সার্কিটের বহু ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভব। গাড়ির পেট্রোল ফুরিয়ে যাবার আগে, রাসায়নিক কারখানায় কোন তরলের সময়মত যোগান সুনিশ্চিত করতে এমন সার্কিটকে সুন্দরভাবে কাজে লাগান সম্ভব। দেখা যাক কেমন হবে এই তল নির্দেশক সার্কিটটি।

এই সার্কিটটির কার্যপ্রণালী বুঝবার জন্য আমরা তরলটিকে প্রথমে তড়িতের পরিবাহী এবং পরে তড়িতের অপরিবাহী ভেবে নিয়ে ব্যবস্থা নেব এবং ব্যাখ্যা করব।
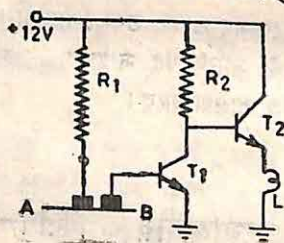
তরলের তল নির্দেশক সার্কিট

যখন তরলটি পরিবাহী তখন AB তল বরাবর বা তার উপরে যতক্ষণ সেটি বর্তমান থাকবে ততক্ষণ T_1 ট্রানজিস্টরটি পরিবাহী থাকবে। এর ফলে T_1-এর কালেক্টরে প্রায় শূন্য ভোল্টেজ থাকার সুবাদে T_2 ট্রানজিস্টরটি সক্রিয় হবে না। ফলে T_2-এর কালেক্টরে রাখা আলোটি জ্বলে উঠবে না অথবা যদি T_2-এর কালেক্টরে একটি কম ভোল্টেজের রিলে যুক্ত থাকে, সেটি সক্রিয় হবে না। যখন তরলটি খরচ হতে হতে AB তলের নিচে নেমে যাবে তখন T_1 ট্রানজিস্টরের বেস বায়াস সার্কিট বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং সেটি নিষ্ক্রিয় হবে। সঙ্গে সঙ্গে T_1-এর কালেক্টর ভোল্টেজ বেড়ে গিয়ে প্রায় সাপ্লাই ভোল্টেজের সমান হবে। T_2 ট্রানজিস্টরটি এই অবস্থায় সক্রিয় হবে এবং পূর্বোক্ত আলোটি জ্বলে উঠবে বা রিলেটি সক্রিয় হয়ে অ্যালার্ম বেজে উঠবে।

এবারে দেখা যাক তরল পদার্থটি তড়িৎ পরিবাহী না হলে কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। সেক্ষেত্রে আমরা একটি রীড সুইচ ব্যবহার করব।

এটি এমন একটি সুইচ যেটি বাইরে থেকে একটি স্থায়ী দণ্ড চুম্বকের সাহায্যে অন্ করা যায়। চুম্বকটি সরিয়ে নিলে সুইচটি স্বাভাবিক অবস্থায় অফ থাকবে।

যতক্ষণ তরলটি নির্দিষ্ট তল বরাবর বা তার উপরে থাকবে ততক্ষণ রীড সুইচটি দণ্ড চুম্বকের প্রভাবে অন থাকবে। এর পরের ব্যাখ্যা পূর্ববর্ণিত ব্যাখ্যার সাথে অভিন্ন।
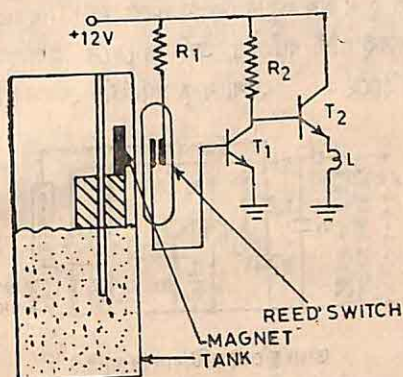
তল নির্দেশক সার্কিটে রীড সুইচের ব্যবহার

যখন ঐ তরল পদার্থটি নির্দিষ্ট তলের নিচে নেমে যাবে তখন দণ্ড চুম্বকটিও নিচে নেমে যাবার ফলে রীড সুইচটি অফ হয়ে যাবে। এর পরের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অভিন্ন থাকায় তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ট্রানজিস্টর T_1—BC149, T_2—AC127
২। রেজিস্টর R_1—47K$\frac{1}{2}$W, R_2—10K$\frac{1}{2}$W
৩। বাল্ব 12V, 0·1A
৪। রীড সুইচ, দণ্ড চুম্বক
৫। তার, সল্ডার ইত্যাদি।

১৬নং প্রজেক্ট
তালা ছুঁলেই শব্দ

তালা ভেঙে ঘরে ঢোকা বা আলমারি থেকে মূল্যবান জিনিস নিয়ে পালানোর ঘটনাতো হামেশাই ঘটে। অনেক সময় এ ঘটনা অজান্তে হচ্ছে আবার কখনও কখনও চোখের সামনে ঘটলেও মুখে শব্দ করার উপায় থাকে না। এখানে এমন একটি সার্কিট দেখানো হচ্ছে যেটি সতর্ক ঘণ্টি বাজিয়ে জানিয়ে দেবে অবাঞ্ছিত কোন ব্যক্তি দরজার বা আলমারির তালা ছুঁয়েছে। দেখা যাক্ সার্কিটটি কেমন হবে।
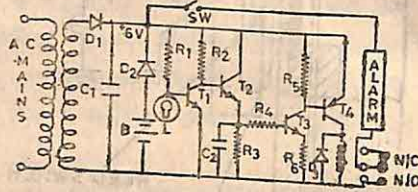
তালা ছুঁলেই ঘণ্টি বাজার সার্কিট

এখানে তালার সাথে T_1 ট্রানজিস্টরের বেসকে লুকিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় T_1 ট্রানজিস্টরটি R_1 রোধ বরাবর বেস বায়াস পাবার ফলে এটি পরিবাহী থাকবে। এর ফলে T_1 এর কালেক্টরে খুব কম ভোল্টেজ বর্তমান থাকবে। এই ভোল্টেজ প্রায় শূন্যের কাছে থাকার ফলে T_2 ট্রানজিস্টরটি সচল হবে না। বুঝতে অসুবিধে হবার কারণ নেই এই অবস্থায় T_3 ও T_4 ট্রানজিস্টর দুটিও নিষ্ক্রিয় থাকবে। এবার দেখা যাক তালা L ছুঁলে কী অবস্থা দাঁড়াবে। L ছোঁয়ার সাথে সাথে T_1 এর বেস ভূমির সাথে যুক্ত হবে এবং T_1 এর কালেক্টর প্রবাহ বন্ধ হবে। এই অবস্থায় T_2 এর বেস ভোল্টেজ হঠাৎ বেড়ে যাবে এবং অনেকটা ধনাত্মক হয়ে পড়বে। খুব স্বাভাবিক কারণেই T_2 সক্রিয় হবে এবং T_3 ও T_4 ট্রানজিস্টর দুটিও সক্রিয় হবে। T_4 এর কালেক্টরে একটি 6V রিলে বসিয়ে রাখা হয়েছে। যখন T_4 সক্রিয় হবে তখন এই রিলেটিও সচল হবে। একটি অ্যালার্ম ঘণ্টি, যেটি 6V সাপ্লাইতে চলতে পারে, এমন ভাবে সার্কিটে রাখা আছে যেটি সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠবে। অবশ্য তালাটি ছেড়ে দিলেই শব্দটি বন্ধ হয়ে যাবে। এই সার্কিটের সামান্য হের ফের করে নিলেই এমন ব্যবস্থা করা যায়, যাতে তালাটি একবার ছুঁয়ে ছেড়ে দিলেও অ্যালার্ম ঘণ্টিটি বাজতেই থাকবে। একটি রিসেট টিপে তখন সেটি বন্ধ করা যাবে। এখানে সুইচ SW কে লুকিয়ে রাখতে হবে যেন মালিক নিজে যখন তালাটি খুলবেন তখন সেটি অফ করে নিতে পারেন। নইলে নিজের তালা নিজে ছুঁলেও চুরির দায়ে ধরা পড়ার যোগাড় হবে!

সাপ্লাই সার্কিটটি এমন ভাবে করা হয়েছে যাতে সার্কিটটি মেইনস এবং প্রয়োজনে ব্যাটারী থেকে চলতে পারে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। স্টেপডাউন ট্রান্সফর্মার ১টি 230V/6V 500mA.
২। ডায়োড D_1, D_2, $_3$—BY 125
৩। কনডেনসার C_1—1000μF 12V, C_2—2μF 12V
৪। রেজিস্টর R_1—1M$\frac{1}{2}$W, R_2—100K $\frac{1}{2}$W, R_3—220K $\frac{1}{2}$ W, R_4—100K $\frac{1}{2}$ W, R_5—1K $\frac{1}{2}$ W, R_6—47Ω $\frac{1}{2}$W
৫। ট্রানজিস্টর T_1, T_2—BC 149, T_3—BC 147, T_4—AC188 বা SK 100
৬। 6V রিলে ১টি, 6V অ্যালার্ম ১টি
৭। সুইচ, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

১৭নং প্রজেক্ট

ইলেকট্রনিক তুলাদণ্ড

এবারে আমরা এমন একটি সার্কিট তৈরি করব যার সাহায্যে কোন বস্তুর ওজন মাপা যাবে। সার্কিটটি নিচে দেখান হয়েছে।
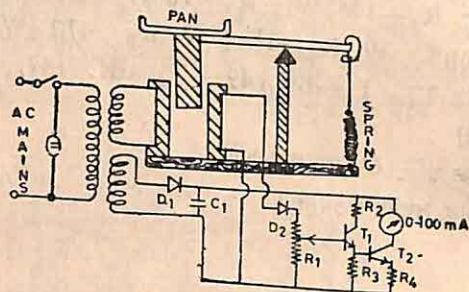
ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স

যে বস্তুটির ওজন মাপতে চাই সেটিকে তুলাদণ্ডের (balance) পাত্রে রাখলে একটি মিটারের পাঠ থেকে ওজনটি পাওয়া যাবে। বস্তুর ওজন যত বেশী হবে মিটারের পাঠও তত বেশী হবে। অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশী ওজনের বস্তুকে যেন তুলা পাত্রে বসিয়ে দেওয়া না হয়। তেমন করা হলে মিটারের পুরো স্কেলের পাঠ ছাড়িয়ে যাবে এবং মিটারটি খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকবে।

এবারে দেখা যাক কেমন ভাবে সার্কিটটি কাজ করে অর্থাৎ বস্তুর ওজনকে একটি মিটারের পাঠ মারফৎ জানিয়ে দেয়। যে পাত্রটির উপর বস্তুটিকে রাখা হয় তার নিচে একটি চুম্বক পদার্থের কোর (যেমন লোহার কোর) লাগান থাকে। বস্তুটি বসিয়ে দিলে পাত্রটি নিচের দিকে নামতে থাকে এবং সেই কোরটি একটি অন্তরক নলের মধ্যে ঢুকতে থাকে। এই নলটির উপর দুটি তারের কুণ্ডলী জড়ান রয়েছে। একটি কুণ্ডলীতে খানিকটা এসি ভোল্টেজ দেওয়া রয়েছে। যখন কোরটি নলের বাইরে রয়েছে, অর্থাৎ যখন কোন ওজন চাপান হয়নি, তখন দ্বিতীয় কুণ্ডলীতে তেমন ভোল্টেজ থাকে না। কিন্তু ওজন চাপানোর সাথে সাথে কোরটি নলের ভিতর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্বে ঢুকে স্থির থাকবে। এই দূরত্বের উপর নির্ভর করে দ্বিতীয় কুণ্ডলীতে বেশ খানিকটা এসি ভোল্টেজ তৈরী হবে। বুঝতে আশা করি অসুবিধে নেই এই ভোল্টেজ তৈরির ব্যাপারটি ট্রান্সফর্মারের নীতি মেনে চলে। বলতে গেলে ওজন মাপার ব্যাপারটি আমরা সেরে ফেলেছি। এই এসি ভোল্টেজকে একটি ডায়োডের সাহায্যে রেক্টিফাই (rectify) করে একটি ভোল্ট মিটারের সাহায্যে মেপে নিলেই ওজনের ধারণা পাওয়া যাবে। তবে এভাবে ওজনের ধারণা করলে ওজনটি খুব সুক্ষ্মভাবে মাপা কঠিন হবে আর তাছাড়া এমন জাতের তুলাদণ্ডকে ইলেক্ট্রনিক ব্যালেন্স না বলে ইলেকট্রিক্যাল ব্যালেন্স বলতে হবে !

এবারে দেখা যাক্ দুটো সমস্যাকে কেমন করে সমাধান করা যায়। রেক্টিফায়েড (**rectified**) ভোল্টেজকে একটি ট্রানজিস্টরের বেসে জুড়ে দিলেই সমস্যা মিটে যাবে। ওজন যত বেশী এসি ভোল্টেজও সমানুপাতে বেশী হবে। বেস ভোল্টেজ যত বাড়বে ট্রানজিস্টরের কালেক্টর কারেণ্ট তত বেশী হবে। এর ফলে সামান্য ওজনের জন্যও বেশ খানিকটা কালেক্টর কারেণ্ট পাওয়া যাবে। এই কারেণ্টকে একটি মিটারের সাহায্যে মেপে নিলেই ওজনের ধারণা মিলবে। মিটারের পাঠ থেকে সরাসরি ওজন পেতে হলে বিভিন্ন ওজন বসিয়ে মিটারের পাঠকে ক্যালিব্রেট (callibrate) করে নেবার প্রয়োজন রয়েছে।

খুব ছোট ওজন মাপার জন্য এই জাতীয় ব্যালেন্স তৈরি করতে চাইলে একটি ট্রানজিস্টরের বদলে দুটি ট্রানজিস্টরকে ডার্লিংটন জুটির মত জুড়ে নিলে অনেক বেশী গেইন পাওয়া যাবে এবং ওজনটিও অনেক নির্ভুল ভাবে মাপা যাবে।

এই প্রজেক্টটি তৈরির জন্য কিছু মেকানিক্যাল কাজ ধৈর্য্য ধরে করতে হবে। এদের মধ্যে স্প্রিংকে একটি হুকের সাথে লাগান এবং তুলা পাত্রটিকে একটি শক্ত দণ্ডের সাহায্যে হুকের সাথে জুড়ে দেওয়া ইত্যাদি প্রধান।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। একটি স্টেপডাউন ট্রান্সফর্মার, যার কোরটি বাদ দিয়ে নিলে হবে—প্রাইমারি 230V, সেকেণ্ডারি 6V, 500mA। এটি ইনডাকশান কয়েলের কাজ করবে।

২। উপরের কয়েলের মধ্যে উঠানামা করার মত একটি নরম লোহার কোর।

৩। ১টি ট্রান্সফর্মার। প্রাইমারি 240V, সেকেণ্ডারি 6V, 500 mA, 6V, 500 mA।

৪। ডায়োড D_1, D_2—BY125।

৫। ট্রানজিস্টর T_1—BC149, T_2—AC127।

৬। ক্যাপাসিটর C_1—1000μF 25V ইলেকট্রোলিটিক।

৭। রেজিস্টর R_1—10K পোটেনশিওমিটার R_2, R_3—20K$\frac{1}{2}$W, R_4—100Ω।

৮। মিটার 0—100mA।

৯। মেকানিক্যাল ফিটিংস (ছবি অনুযায়ী)।

১০। সুইচ, নিয়ন, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

১৮নং প্রজেক্ট

ভ্যাকুয়াম মাপার যন্ত্র

কোন একটি বদ্ধ পাত্রের বায়ুর পরিমাণ যত কমবে সেই পাত্রের চাপ তত কমবে অর্থাৎ তার ভ্যাকুয়াম (vacuum) বা বায়ুশূন্য অবস্থা তত বাড়বে। আমরা একটি সহজ সার্কিটের সাহায্য নিয়ে সেই পাত্রের ভ্যাকুয়াম মাপার ব্যবস্থা করতে পারি। প্রথমে সার্কিটটি দেখিয়ে দিচ্ছি।
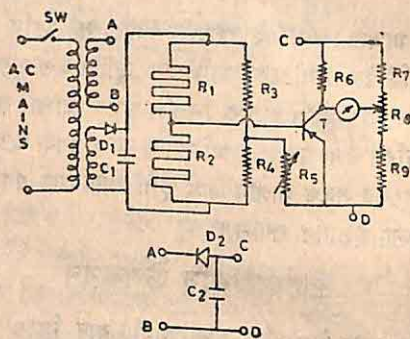
ভ্যাকুয়াম নির্দেশক সার্কিট

এবারে দেখা যাক্ সার্কিটটি কেমন করে কাজ করে। একটি হিটারের তার মাইকার উপর জড়িয়ে দুটি রোধ R_1 এবং R_2 তৈরি করা হয়েছে। অন্য দুটি রোধকে এমন ভাবে R_1 এবং R_2 এর সাথে জোড়া আছে যাতে এরা একটি ব্রীজ সার্কিটের মত কাজ করে। এই ব্রীজের সাথে একটি ট্রানজিস্টরের এমিটার এবং বেসকে লাগিয়ে রাখা আছে। R_1 রোধটি বায়ুতে রাখা থাকে এবং R_2 রোধটি রাখা আছে বদ্ধ পাত্রে। R_2 এমন ভাবে রাখা আছে যাতে তার টার্মিনাল দুটো বদ্ধ পাত্রের ভেতর থেকে বায়ু নিরোধক সিলের (seal) ভেতর থেকে বাইরে আনা যায়। এই R_1 এবং R_2 জুটির মধ্য দিয়ে কিছুটা পরিমাণ কারেণ্ট পাঠিয়ে রোধ দুটিকে গরম করা হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় বেস ও এমিটারের মধ্যে কোন ভোল্টেজ তফাৎ থাকবে না। যখন পাত্রের বায়ু ক্রমশ কমতে থাকবে তখন R_2 এর তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে কারণ কম পরিমাণ বায়ু R_2 এর উপর থেকে তাপ বয়ে নিয়ে যাবে। এই অসমান রোধ সৃষ্টির ফলে বেস ও এমিটারের মধ্যে বেশ কিছুটা ভোল্টেজ পার্থক্য সৃষ্টি হবে এবং ট্রানজিস্টরের বেসে কিছুটা কারেণ্ট প্রবাহ ঘটবে। পাত্রটি যত বেশী বায়ু শূন্য হবে এই বেস প্রবাহ তত বেশী হবে। সঙ্গে সঙ্গে কালেক্টরে তত বেশী পরিমাণ কারেণ্ট প্রবাহিত হবে। কালেক্টরের এই প্রবাহ মাত্রা একটি কারেণ্ট মিটার দিয়ে মেপে নিলেই পাত্রের বায়ু শূন্য বা অবস্থার ভ্যাকুয়াম সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে। তবে অন্য একটি উপায়ে এই ধারণা অধিকতর সুক্ষ্ম ভাবে করা যেতে পারে। এবারে সেই বিষয়টি

বোঝার জন্য কালেক্টর অংশের অন্য একটি ব্রীজের ব্যাপার বুঝতে হবে। এখানে কালেক্টর প্রবাহ যত বাড়বে কালেক্টর বিন্দুর ভোল্টেজ তত কমতে থাকবে। একটি মিটারকে এমন ভাবে বসান আছে যাতে তার একটি প্রান্ত একটি স্থির ভোল্টেজের সাথে যুক্ত রয়েছে অথচ অন্য প্রান্তটি রয়েছে কালেক্টর প্রান্তে। এর ফলে মিটারের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ পার্থক্য যত বাড়বে মিটারের মধ্য দিয়ে তত বেশী কারেণ্ট প্রবাহ ঘটবে। এই প্রবাহমাত্রা মেপে নিয়ে ভ্যাকুয়াম মাপা যাবে। একটি কথা এখানে বলা দরকার। সুক্ষ্ম ভাবে ভ্যাকুয়াম মাপতে চাইলে অন্য একটি ভ্যাকুয়াম মিটারের সাহায্য নিয়ে কারেণ্ট মিটারটি ক্যালিব্রেট করে নিতে হবে।

এই সার্কিটকে বায়ুর গতিবেগ মাপার কাজেও লাগান যেতে পারে। সেক্ষেত্রে R_1 ও R_2 এর মধ্যে একটি রোধকে একটি বদ্ধ পাত্রে অন্যটিকে হাওয়ায় খোলা অবস্থায় রেখে দিলেই বায়ুর গতিবেগ মাপা যাবে। এই গতিবেগ যত কম বা বেশী হবে খোলা রোধের তাপ মাত্রার তারতম্য হওয়ার ফলে বেস ও এমিটারের মধ্যে ভোল্টেজের পার্থক্য তত কম বা বেশী হবার সুবাদে সার্কিটটি আগের মতই কাজ করবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ট্রান্সফর্মার প্রাইমারি 230V সেকেণ্ডারি 6V, 500 mA, 12V 2A

২। হিটার তার ও মাইকা সিট

৩। রেজিস্টর R_3, R_4—5K10W Wire Wound, R_5—10K1W পোটেন-সিওমিটার, R_6—100Ω$\frac{1}{2}$W, R_7, R_9—1K$\frac{1}{2}$W, R_8—10K পোটেনসিওমিটার

৪। ডায়োড D_1, D_2—BY 127

৫। ক্যাপাসিটর C_1—1000µF 12V ইলেকট্রোলিটিক

৬। ট্রানজিস্টর AC 188

৭। 0 – 10mA মিটার

৮। সুইচ, তার, সল্ডার প্রভৃতি।

১৯নং প্রজেক্ট

ইলেক্‌ট্রনিক টাইম ডিলে সার্কিট

আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা হ'ল সুইচ অন্ করার সাথে সাথেই একটি সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হয়। কিন্তু এমন অনেক ব্যবহারিক প্রয়োজনের ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে সুইচটি অন্ করার কিছুটা সময় পরে বিদ্যুৎ প্রবাহ কাম্য। উদাহরণ স্বরূপ ফটো তোলার কাজে ব্যবহৃত ক্যামেরার কথাই উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি সুইচ টিপে দিয়ে নিজের ফটো নিজেই তোলার ব্যবস্থা করতে গেলে উপরোক্ত ব্যবস্থা সম্বলিত ক্যামেরা থাকলে কাজটি করা যাবে। আবার ভাল্ব সার্কিটে ভাল্বের ফিলামেণ্টটি পুরোপুরি জ্বলবার আগে তার প্লেট ভোল্টেজ দেওয়া যাবে না। এক্ষেত্রেও একটি স্বয়ংক্রিয় টাইম ডিলে সার্কিট মারফৎ কয়েক সেকেণ্ড পরে ভাল্বের প্লেট ভোল্টেজ প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করা সম্ভব। বলা বাহুল্য দুই বা ততোধিক ক্রিয়া শুরুর মাঝে কিছুটা ব্যবধান বজায় রাখার প্রয়োজন হলে একটি ইলেক্ট্রনিক টাইম ডিলে সার্কিট ব্যবহার করে কাজটি সহজেই সারা যাবে। একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই সময়ের ব্যবধান ক্ষেত্রবিশেষে এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগ বা তারও কম এবং কখনও কখনও বেশ কয়েক মিনিটও হতে পারে। ভূমিকাটুকুর উদ্দেশ্য হ'ল এই জাতীয় সার্কিটের গুরুত্ব ও প্রয়োজনকে যথাযথভাবে বুঝতে সাহায্য করা। এবারে দেখা যাক কেমন করে এই সার্কিটটি বানাতে হবে। আমরা এখানে যে সার্কিটটি দেখাব সেটি কয়েক সেকেণ্ড থেকে শুরু করে কয়েক মিনিট পর্যন্ত সময় ব্যবধান সৃষ্টিতে চমৎকারভাবে কাজ করবে।
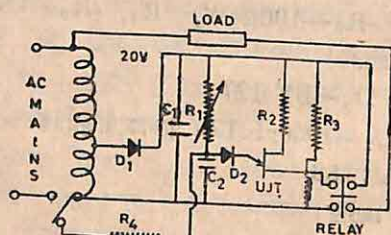
টাইম ডিলে সার্কিট

আসুন বুঝতে চেষ্টা করি এই সার্কিটটির কার্যপ্রণালী। দেখতে পাচ্ছেন সার্কিটে একটি **UJT** ব্যবহার করেছি। সুইচ অন করার পরে অটোট্রান্সফর্মারের সেকেণ্ডারীতে প্রায় পনেরো ভোল্ট পাওয়া যাবে। এই এসি ভোল্টেজ ডায়োড D_1 মারফৎ রেক্টিফায়েড হয়ে C_1 কনডেনসারকে চার্জ করতে থাকবে এবং সম্পূর্ণ চার্জ হবার পর C_1-এর ভোল্টেজ দাঁড়াবে প্রায় কুড়ি ভোল্টের মত। এই ভোল্টেজ R_1 রোধের মধ্য দিয়ে C_2 কনডেন্সারকে চার্জ করতে থাকবে। C_2তে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোল্টেজ তৈরি

হবার সাথে সাথে D_2 ডায়োড মারফৎ UJT-র এমিটার ও এক নম্বর বেস-এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহ হতে থাকবে। এই অবস্থায় UJT-র মধ্যে বেশ খানিকটা কারেন্ট প্রবাহ ঘটবে এবং রিলেটি অন হবে। রিলে অন হলে লোড কারেন্ট প্রবাহ শুরু হবে। C_1 ডিসচার্জ হয়ে একবার UJT অন হবার পরেই সেটি অফ হবে। কিন্তু রিলের সংযোগ এমনভাবে করা হয়েছে যাতে রিলেটি তখনও অন থাকে। কথা হচ্ছে সুইচ অন করার কত পরে লোডের কারেন্ট প্রবাহ হবে সেটি R_1 ও C_2-এর মিলিত মানের উপর নির্ভর করবে। বিভিন্ন পরিমাণ সময় ব্যবধান পাবার জন্য R_1 কে পরিবর্তনযোগ্য রাখা হয়েছে। সুইচ অফ করার সাথে সাথে লোডের প্রবাহ বন্ধ হবে এবং C_2-এর চার্জ R_4 রোধ মারফৎ প্রশমিত হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। একটি অটোট্রান্সফর্মার
২। ডায়োড D_1, D_2—BY127
৩। UJT একটি
৪। কনডেন্সার C_1—100 μF, 100 volt, C_2—1000μF, 25 volt
৫। রোধ R_1—100K পোটেনসিওমিটার, R_2—2K, R_3—4·7K,
R_4—470Ω
৬। 15 ভোল্ট রিলে একটি।

২০নং প্রজেক্ট

ইলেক্‌ট্রনিক টাইমার সার্কিট

আগের একটি প্রজেক্টে আমরা দেখেছি কেমন করে দুটি ক্রিয়া শুরুর মাঝে কিছুটা সময়ের ব্যবধান বা ডিলে রাখার ব্যবস্থা করা যায়। এবারে আমরা দেখব কোন একটি সার্কিটের তড়িৎ প্রবাহ কেমন করে একটি নির্দিষ্ট সময় যাবৎ চলবে তার ব্যবস্থা করা যায়। একটু বিশদ করে বলা যাক। মনে করি আমরা একটি সার্কিটে কয়েক সেকেণ্ড বা কয়েক মিনিট প্রবাহ পাঠাব এবং ঐ সময় পরে সার্কিটটি আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। এরকম প্রয়োজনের বহু ক্ষেত্র রয়েছে। আমি একটি উদাহরণ দিয়ে ধারণাটি স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। যাঁরা ইনডাকশন ফার্নেসের সাথে পরিচিত তাঁরা জানেন কোন ধাতুর একটি টুকরাকে গলাবার জন্য একবারে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড কারেণ্ট পাঠানো হয়। তারপরে আপনা আপনি প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। পুনরায় সুইচ অন করলে ধাতু টুকরার ভেতরে আবার প্রবাহ চালু হবে। যখন টুকরাটি একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছুবে বা গলে যাবেতখন আর সার্কিট অন করা হবে না। অল্প সময় যাবৎ বারে বারে এইভাবে প্রবাহ নিশ্চিত করতে গেলে যে সার্কিটের সাহায্য নেওয়া হয় তাকে টাইমার সার্কিট বলা হয়। এখন দেখা যাক এটি কেমন করে তৈরি করব।
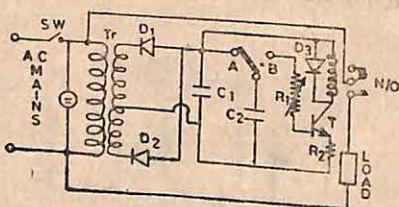
ইলেক্‌ট্রনিক টাইমার সার্কিট

এবারে দেখা যাক সার্কিটটি কেমন করে কাজ করবে। পুশ সুইচটি টিপে দিলে A বিন্দুর সাথে যুক্ত হবে এবং C_2 কনডেনসারটি ডিসি সাপ্লাই থেকে চার্জ সংগ্রহ করতে থাকবে। খানিকটা সময় টিপে ছেড়ে দিলেই সুইচটি আপনা থেকে B বিন্দুর সাথে যুক্ত হবে। B বিন্দুর সঙ্গে সংযোগের সাথে সাথে ট্রানজিস্টরটির বেসে কারেণ্ট প্রবাহ হবে। কারণ C_2-এর যে প্রান্তটি B বিন্দুর সাথে যুক্ত হ'ল সেটিতে ধনাত্মক ভোল্টেজ রয়েছে এবং যে ট্রানজিস্টরটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি NPN জাতের। বেস প্রবাহের সাথে সাথে কালেক্টর প্রবাহ শুরু হবে এবং কালেক্টরে যুক্ত রিলেটি সচল হবে। রিলের সচল হওয়ার অর্থ হ'ল সাধারণভাবে অফ প্রান্তটির মধ্যে সংযোগ ঘটা। সাথে সাথে লোডের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ সুনিশ্চিত হবে।

কিন্তু এই বিদ্যুৎ প্রবাহ অনির্দিষ্ট কাল চলতে পারবে না। বেস প্রবাহ চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে C_2 কনডেনসারটি R_1 রোধের মধ্য দিয়ে চার্জ হারাতে থাকবে অর্থাৎ ডিসচার্জ হতে শুরু করবে। যখন C_2-এর ভোল্টেজ এক ভোল্টের নিচে নেমে যাবে তখন ট্রানজিস্টরের কালেক্টর প্রবাহ বন্ধ হবে এবং রিলেটি অচল হয়ে পড়বে। এর ফলে লোডের প্রবাহটিও বন্ধ হয়ে যাবে।

কথা হল C_2-এর ভোল্টেজ কখন এক ভোল্টের নিচে নেমে যাবে। এই সময়টি নির্ভর করবে প্রথমে C_2-এর ভোল্টেজ কত ছিল এবং C_2-এবং ও R_1-এর মান কী রকম। যেহেতু একটি নির্দিষ্ট প্রাথমিক ভোল্টেজ থেকে C_2 কনডেনসারটি ডিসচার্জ হতে শুরু করে সেইজন্য C_2 ও R_1-এর উপর নির্ভর করবে কত ধীরে ধীরে বা তাড়াতাড়ি এটি ডিসচার্জ হবে। এদের মান যত বেশী, ডিসচার্জ হবার সময় তত বেশী হবে। তাই C_2 অপরিবর্তিত রেখে শুধু বেসের রোধ R_1-এর মানকে কমালে বা বাড়ালে ডিসচার্জ সময় কমান বা বাড়ান যেতে পারে। এইভাবে R_1-এর মান পাল্টে পাল্টে লোডের প্রবাহের সময় নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। স্টেপ-ডাউন ট্রান্সফর্মার 230/12V 500 mA

২। ডায়োড D_1, D_2, D_3—BY127

৩। ট্রানজিস্টর T—2N3055

৪। কনডেন্সার C_1, C_2—1000μF 25V ইলেক্ট্রোলিটিক

৫। রেজিস্টর R_1—10K পোটেনসিওমিটার $\frac{1}{2}$W, R_2—10Ω$\frac{1}{2}$W

৬। রিলে 12 Volt 220Ω

৭। সুইচ, তার, সলডার ইত্যাদি।

২১নং প্রজেক্ট

অডিও অসিলেটর সার্কিট

আমরা দুটি মাত্র ট্রানজিস্টর ব্যবহার করে একটি অডিও অসিলেটর সার্কিট তৈরির পদ্ধতি দেখাব। এই সার্কিটটির সাহায্যে একটি লাউড স্পীকার চালিয়ে অডিও শব্দ কানে শুনতে পাওয়া যাবে।
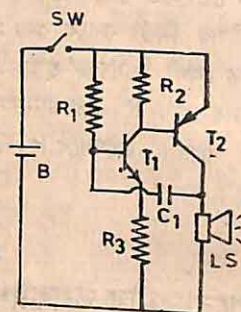
অডিও অসিলেটর

এখানে দুটি ট্রানজিস্টরকে সরাসরি যুক্ত কমপ্লিমেণ্টারি অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অসিলেটরের কম্পাঙ্ক নির্ধারিত হয় রোধ R_1 এবং ক্যাপাসিটর C_1-এর মিলিত মানের সাহায্যে। এই কম্পাঙ্কের মান হচ্ছে $\frac{1}{R_1C_1}$ হার্জ যেখানে R_1 এর একক ওহ্‌ম এবং C_1 এর একক ফ্যারাড। আবার R_1 কে মেগওহম ও C_1-কে মাইক্রোফ্যারাডে মাপলেও ব্যাপারটি একই হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। T_1—BC147, T_2—AC188
২। রোধ R_1—$100K\frac{1}{2}W$, R_2—$3{\cdot}3K\frac{1}{2}W$, R_3—$100\Omega\frac{1}{2}W$
৩। ক্যাপাসিটর C_1—·01 μF সিরামিক
৪। লাউড স্পিকার—2″ স্পিকার একটি, 8Ω রোধ সম্পন্ন
৫। 6V ব্যাটারী একটি
৬। তার, সুইচ ইত্যাদি।

২২নং প্রজেক্ট

ইলেকট্রনিক সাইরেন

আগের সার্কিটটি যে শব্দ সৃষ্টি করে সেটি স্থির শব্দ। সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে সার্কিটটিকে আমরা একটি সাইরেনে রূপান্তরিত করতে পারি। প্রথমেই বলে রাখি সাইরেনের জন্য মূল প্রয়োজন একটি উঠানামা করবে এমন শব্দ।

এবারে আমরা সার্কিটটি দেখব এবং তার কার্যপ্রণালী বুঝতে চেষ্টা করব।
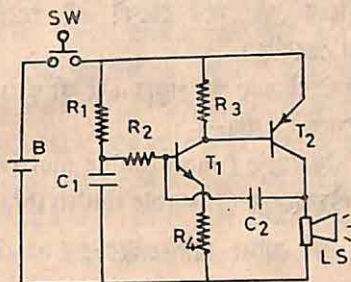
ইউেকট্রনিক সাইরেন

এই সার্কিটে সুইচ SW অন করার সাথে সাথে C_1 কনডেন্সারটি R_1 রোধের মধ্য দিয়ে চার্জ হতে শুরু করবে। R_1 ও C_1-এর সংযোগস্থলে ভোল্টেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে T_1 ট্রানজিস্টরটি সক্রিয় হবে এবং T_2 ট্রানজিস্টরটিকেও সচল করবে। এখানে T_1টি NPN জাতের এবং T_2টি PNP জাতের। এর ফলে T_1 ও T_2 উভয়ে একই সঙ্গে সক্রিয় হবার সর্ত পূরণ করবে। C_2 ফিড ব্যাক (feed back) কনডেন্সারের কাজ করবে এবং এর ফলে T_1 ও T_2 জুটি একটি অসিলেটরের কাজ করবে। মজা হচ্ছে C_1 কনডেন্সারটি চার্জ হতে শুরু করলে অসিলেশন শুরু হবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পরে কনডেন্সারটি ডিসচার্জ হয়ে যাবার পরে অসিলেশন বন্ধ হবে। এইভাবে শব্দের শুরু ও শেষ এমন গতিতে হবে যার ফলে এই শব্দ একটি সাইরেনের শব্দের মত শোনাবে। SW একটি পুশ সুইচ বলে সাইরেন একবার বেজে বন্ধ হয়ে যাবে। যতবার SW অন করা হবে ততবার এই শব্দ পাওয়া যাবে। তাই এটিকে একটি ম্যানুয়ালি অপারেটেড ইলেক্ট্রনিক সাইরেন বলা যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। T_1—BC147, T_2—AC188

২। R_1—22K$\frac{1}{2}$W, R_2—100K$\frac{1}{2}$W, R_3—3·3K$\frac{1}{2}$W, R_4—100Ω$\frac{1}{2}$W

৩। C_1—200μF 12V, C_2—0·01μF সিরামিক

৪। LS—8Ω লাউড স্পিকার একটি

৫। 6V ব্যাটারী একটি

৬। পুশ সুইচ, তার ইত্যাদি।

২৩নং প্রজেক্ট

মাল্টিভাইব্রেটর সার্কিট

আমরা অনেকেই মাল্টিভাইব্রেটর কথাটির সাথে পরিচিত। কিন্তু কী সেটি এবং কেমন করেই বা কাজ করে সেই সার্কিটটি তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। অথচ ইলেকট্রনিক্স জগতে এই মাল্টিভাইব্রেটর সার্কিট অসংখ্য প্রয়োজনীয় কাজ করে থাকে। এদের এই ব্যাপক ব্যবহারের কথা মনে রেখেই এই প্রজেক্টটির সাথে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভেবেছি।

প্রথমেই দেখা যাক মাল্টিভাইব্রেটর কয় প্রকার এবং কী কী। মাল্টিভাইব্রেটরগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

১। মনোস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর (monostable multivibrator)

২। বাইস্টেব্‌ল মাল্টিভাইব্রেটর (bistable multivibrator)

৩। অ্যাস্টেবল বা ফ্রী রানিং মাল্টিভাইব্রেটর (astable or free running multivibrator)

আমরা একটি করে সার্কিট দেখব এবং তার কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করব। প্রথমেই দেখা যাক মনোস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর সার্কিট।
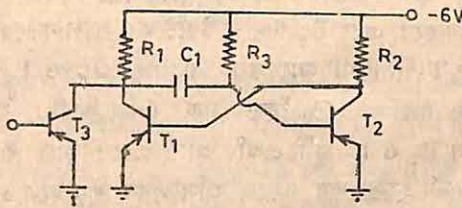
মনোস্টেবল সার্কিট

এই সার্কিটটির একটি মাত্র স্থায়ী অবস্থা (stable state) রয়েছে। এ কথাটির অর্থ হ'ল—T_1 ট্রানজিস্টরটি অফ এবং T_2 ট্রানজিস্টরটি অন অবস্থায় থাকার স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। যদি কোন সিগন্যাল ব্যবহার করে এই স্বাভাবিক অবস্থাকে পাল্টান হয় যার ফলে T_1 অন এবং T_2 অফ হবে তাহলে দেখা যাবে কিছুটা সময় বাদেই আবার দুটি ট্রানজিস্টর তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। কতক্ষণ বাদে এই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে সেটি নির্ভর করবে C_1 ও R_3 এর মানের উপর।

এবারে দেখা যাক কেমন করে এই সার্কিট একটি মাত্র স্থায়ী অবস্থায় থাকতে চায় এবং কেমন করে এই স্থায়ী অবস্থার পরিবর্তন ঘটান সম্ভব।

T_2 ট্রানজিস্টরটি R_3 রোধ মারফৎ যথেষ্ট বেস কারেণ্ট সরবরাহ পাওয়ার ফলে সেটির কালেক্টরে যথেষ্ট পরিমাণ প্রবাহ থাকবে। এর ফলে T_2-এর কালেক্টরে খুব

কম ভোল্টেজ বর্তমান থাকবে। যেহেতু T_1-এর বেসটি T_2-এর কালেক্টরের সাথে সরাসরি যুক্ত রয়েছে তাই T_1-এর ভোল্টেজও স্বাভাবিক কারণেই খুব কম থাকবে। এর ফলে T_1 সক্রিয় হবে না। আমরা এই অবস্থাটিকে স্থায়ী এবং স্বাভাবিক অবস্থা বলছি। এই অবস্থায় T_2-এর কালেক্টর বিন্দুতে আউটপুট প্রায় শূন্য ভোল্ট।

এবার আমরা একটি ঋণাত্মক পালস ভোল্টেজকে T_3-এর বেসে প্রয়োগ করব। সঙ্গে সঙ্গে T_3 ট্রানজিস্টরটি সচল হবে এবং T_1-এর কালেক্টরকে প্রায় শূন্য ভোল্টের কাছে নামিয়ে আনবে। T_1-এর কালেক্টরের এই শূন্য বিভব হওয়ার বার্তাটি C_1 কনডেন্সার মারফৎ T_2-এর বেসে পৌঁছে যাবে। এর ফলে T_2 ট্রানজিস্টরটি সক্রিয় অবস্থা থেকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় যেতে শুরু করবে। সঙ্গে সঙ্গে T_2-এর কালেক্টর ভোল্টেজ বাড়তে থাকবে। এর ফলে কালেক্টরে বেশ খানিকটা আউটপুট ভোল্টেজ পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, T_3-এর বেসে একটি ঋণাত্মক, পাল্‌স প্রয়োগ করে আমরা T_2-এর সক্রিয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হলাম। মজার ব্যাপার হ'ল T_2 ট্রানজিস্টরটি এই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকতে পারবে না। দেখা যাক কেমন করে T_2 তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। C_1 কনডেন্সারটি R_2 রোধের মধ্য দিয়ে ডিসচার্জ হওয়ার ফলে T_2-এর বেসটি পুনরায় ঋণাত্মক ভোল্টেজ প্রাপ্ত হবে এবং T_2 ট্রানজিস্টরটি আবার সক্রিয় অবস্থায় ফিরে যাবে। সাথে সাথে T_1 ট্রানজিস্টরটিও তার পূর্বাবস্থা অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ফিরে যেতে বাধ্য হবে। অতএব দেখা গেল T_3-এর বেসে একটি ঋণাত্মক পাল্‌স প্রয়োগ করে T_2 ট্রানজিস্টরকে পরিবাহী অবস্থা থেকে শুরু করে অপরিবাহী অবস্থায় নিয়ে গিয়ে পুনরায় পরিবাহী অবস্থায় নিয়ে আসা সম্ভব হল। এর ফলে T_1 বা T_2-এর কালেক্টরে একটি সুন্দর স্কোয়ার ওয়েভ (square wave) পাওয়া যাবে।

এই সার্কিটটিকে একটি ডিলে জেনারেটর (delay generator) হিসেবে ব্যবহার করে দুটি ঘটনার মধ্যে নিয়ন্ত্রণযোগ্য (adjustable) সময় ব্যবধান সৃষ্টি করা সম্ভব। C_1 বা R_1-এর পরিবর্তন করে এই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। দেখা গেল এটিকে একটি স্কোয়ার ওয়েভ পাবার কাজেও লাগান যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। T_1, T_2, T_3—সুইচিং ট্রানজিস্টর—2N 2905

২। R_1—1K$\frac{1}{2}$W, R_2—1K$\frac{1}{2}$W, R_3—10K$\frac{1}{2}$W

৩। C_1—50 pF 12V

৪। ব্যাটারী, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

২৪নং প্রজেক্ট

বাইস্টেব্‌ল মাল্টিভাইব্রেটর সার্কিট

এই সার্কিটের সাহায্যে আমরা একটি ট্রানজিস্টরকে অন অথবা অফ অবস্থায় স্থায়ীভাবে রাখতে পারি। ট্রানজিস্টরের দুটি স্থায়ী অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব বলে এই সার্কিটকে বলা হয় বাইস্টেবল (bistable or 2 stable states) মাল্টিভাইব্রেটর। বলা বাহুল্য একটি স্থায়ী অবস্থা থেকে অন্য একটি স্থায়ী অবস্থায় আনতে গেলে ইনপুটে প্রয়োজনীয় পাল্‌স প্রয়োগ করতে হয়। দুটি পাল্‌স প্রয়োগ করলে একটি ট্রানজিস্টর অন অবস্থা থেকে অফ অবস্থা হয়ে পুনরায় অন অবস্থায় আসতে পারে। এর ফলে আউটপুটে একটি পাল্‌স পাওয়া সম্ভব। এবারে সার্কিটটি দেখা যাক।
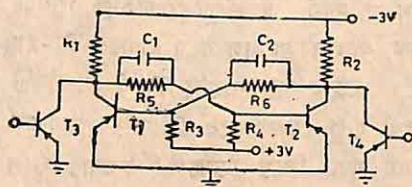
বাইস্টেব্‌ল সার্কিট

যদি ধরে নেওয়া যায় T_1 ট্রানজিস্টরটি পরিবাহী অবস্থায় আছে তাহলে তার কালেক্টরটি প্রায় শূন্য ভোল্টেজে থাকবে। এর ফলে T_2 ট্রানজিস্টরটির বেস ভোল্টেজ বেশ কিছুটা ধনাত্মক হবে এবং T_2 ট্রানজিস্টরটি নিষ্ক্রিয় থাকতে বাধ্য হবে। T_2 নিষ্ক্রিয় হলে এর কালেক্টর ধনাত্মক ভোল্টেজে থাকবে এবং এর ফলে T_1-এর বেস ঋণাত্মক হবে এবং T_1 সক্রিয় থাকার সুযোগ পাবে। অতএব এটি একটি স্থায়ী অবস্থা। এবারে আমরা যদি T_4-এর বেসে একটি ঋণাত্মক পাল্‌স প্রয়োগ করি তাহলে T_4 ট্রানজিস্টরটি সক্রিয় হবে এবং T_2-এর কালেক্টর প্রায় শূন্য ভোল্টেজে যাবে। T_2-এর কালেক্টরের এই শূন্য ভোল্টেজ অবস্থার ফলে T_1-এর বেসটি ধনাত্মক ভোল্টেজ প্রাপ্ত হবার সুবাদে সেটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। T_1 অফ হলে এর কালেক্টর ভোল্টেজ ঋণাত্মক হবে এবং এই ঋণাত্মক ভোল্টেজের প্রভাবে T_2 সক্রিয় বা অন হবে। ট্রানজিস্টরের এই অবস্থা দুটিও আগের মত সমান স্থায়ী। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে T_3-এর বেসে পুনরায় আর একটি ধনাত্মক পাল্‌স প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এই ধরনের একটি সার্কিটকে কাজে লাগিয়ে কম্পুটারে মেমরির (memory) কাজ করা সম্ভব। আবার এরকম কয়েকটিকে একটি বিশেষ কায়দায় যুক্ত করে নিয়ে উচ্চ কম্পাঙ্কের পাল্‌স গুণতির (Pulse Counter) কাজেও লাগান হয়ে থাকে। পাল্‌সের উৎস এবং একটি অসিলোস্কোপ থাকলে এরকম একটি প্রজেক্ট খুব শিক্ষাপ্রদ ও মজার হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ট্রানজিস্টর T_1, T_2, T_3, T_4—2N 2905
২। রেজিস্টর R_1, R_2—$330\Omega\frac{1}{2}$W, R_3, R_4—10K$\frac{1}{2}$W, R_5, R_6—1K$\frac{1}{2}$W
৩। ক্যাপাসিটর C_1, C_2—50 pF
৪। ব্যাটারী, সলডার, তার ইত্যাদি।

২৫নং প্রজেক্ট

অ্যাস্টেব্‌ল মাল্টিভাইব্রেটর

এ পর্যন্ত যে দুটি মাল্টিভাইব্রেটর সার্কিট দেখান হয়েছে সেগুলো থেকে আউট পুট পাল্‌স পেতে হলে ইনপুট পাল্‌স প্রয়োগ করতে হয়েছে। এবারে আমরা যে সার্কিটটি দেখব সেটিতে ব্যবহৃত ট্রানজিস্টরের কোন স্থায়ী অবস্থা নেই। এমনভাবে এটি তৈরি করা হয়েছে যাতে একটি ট্রানজিস্টর পরিবাহী হলে সাথে সাথে অন্যটি অপরিবাহী হবে। উভয়ের পরিবহণ ও অপরিবহণের চরম অবস্থা প্রাপ্তির সাথে সাথে দুজনেই বিপরীতমুখী অবস্থায় যেতে থাকবে। অর্থাৎ, আপনা আপনি ট্রানজিস্টর দুটি পর্যায়ক্রমে পরিবাহী ও অপরিবাহী হবে।
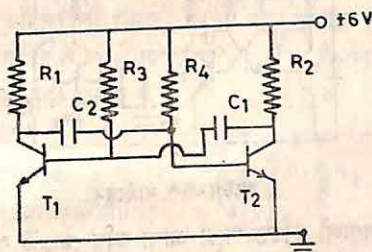
অ্যাস্টেব্‌ল সার্কিট

এই সুন্দর সার্কিটটিকে পাল্‌স তৈরির কাজে লাগান যেতে পারে। এই পাল্‌সের কম্পাঙ্ক নির্ধারিত হবে C_1, R_3 এবং C_2 ও R_4-এর মানের সাহায্যে। যদি সূত্রাকারে লেখা যায় তাহলে

$$T = 0{\cdot}69\ (R_3C_1 + R_4C_2)$$

যেখানে T হ'ল একটি সম্পূর্ণ কম্পাঙ্কের সময়কাল অর্থাৎ

$$f = \frac{1}{T}$$

যদি $R_3 = R_4 = R$ এবং $C_1 = C_2 = C$ রেখে সার্কিটটি তৈরি করা হয় তাহলে $T = 1{\cdot}38\ RC$ হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ট্রানজিস্টর T_1, T_2—BC148
২। রেজিস্টর R_1, R_2—$5K\frac{1}{2}W$, R_3, R_4—$100K\frac{1}{2}W$
৩। ক্যাপাসিটর C_1, C_2—25 μF, 12V

২৬নং প্রজেক্ট

অটোমেটিক সাইরেন

এর আগে একটি ম্যানুয়ালি অপারেটেড সাইরেন তৈরির সার্কিট দেখেছি। এই সার্কিটের সুইচটিকে আমরা একটি অ্যাস্টেব্‌ল মাল্টিভাইব্রেটর দিয়ে সরিয়ে দিলেই সেটি অটোমেটিক বা স্বয়ংক্রিয় সাইরেনে রূপান্তরিত হবে। প্রকৃতপক্ষে অ্যাস্টেব্‌ল মাল্টিভাইব্রেটরটি এখানে ইলেকট্রনিক সুইচের কাজ করছে। এবারে দেখা যাক এই সার্কিটটি কেমন হবে।
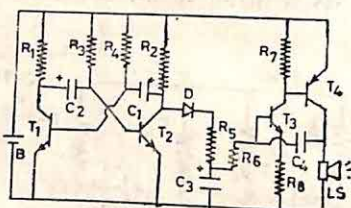
অটোমেটিক সাইরেন

এই সার্কিটের কার্যপ্রণালী বুঝতে পারা আশা করি মোটেই কঠিন নয়। এই প্রজেক্টের দুটি স্পষ্ট অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে রয়েছে অ্যাস্টেব্‌ল মাল্টিভাইব্রেটরটি এবং দ্বিতীয় অংশে রয়েছে সাধারণ সাইরেনের সার্কিট। যেহেতু দুটি অংশের কার্যপ্রণালী আগেই আলাদাভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখানে তাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করলাম।

প্রয়োজনীয় উপকরণ—

১। ট্রানজিস্টর T_1, T_2—BC 148, T_3—BC147, T_4—AC128

২। রেজিস্টর—R_1, R_2—5K$\frac{1}{2}$W, R_3, R_4—100K$\frac{1}{2}$W, R_5—47K$\frac{1}{2}$W, R_6—100K $\frac{1}{2}$W, R_7—3·3K$\frac{1}{2}$W, R_8—100Ω$\frac{1}{2}$W।

২। ক্যাপাসিটর C_1, C_2—25μF 12V, C_3—200μF 12V, C_4—·01 μF ডিস্ক সিরামিক।

৪। ডায়োড D—BY 125।

৫। লাউড স্পিকার LS—8Ω স্পিকার।

৬। ব্যাটারী, তার ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ ব্যাটারীর দুই প্রান্তের সাথে একটি 1000 μF 12V ইলেক্ট্রোলিটিক কনডেন্সার জুড়ে দিলে ব্যাটারীর ভোল্টেজ স্থির থাকবে। সেক্ষেত্রে ঐ মানের একটি কনডেন্সারও সংগ্রহ করতে হবে।

২৭নং প্রজেক্ট
পুতুলের চোখ

অ্যাস্টেব্‌ল মাল্টিভাইব্রেটর সার্কিটকে কাজে লাগিয়ে কেমন করে একটি পুতুলের দুটি চোখকে পর্যায়ক্রমে খোলা ও বন্ধ করা সম্ভব সেটি এই প্রজেক্টটির সাহায্যে দেখান হয়েছে। এই সার্কিটের মূল অংশ হল একটি ফ্রী রানিং মাল্টিভাইব্রেটর। এবারে এই মাল্টিভাই-ব্রেটরের দুটি আউটপুটকে কাজে লাগিয়ে দুটি লাইট এমিটিং ডায়োডের তড়িৎ প্রবাহকে একবার বেশী এবং অন্যবারে প্রায় শূন্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রথমে সার্কিটটি দেখা যাক।

কেমন করে এটি কাজ করে তা বুঝতে পারা আদৌ কঠিন নয়। T_1 ও T_2, ট্রানজিস্টর দুটির সাহায্যে যে অ্যাস্টেব্‌ল মাল্টিভাইব্রেটর বা ফ্রী রানিং অসিলেটরটি তৈরি করা হয়েছে সেটির কার্যপ্রণালী আগেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবারে দেখা যাক্ এই ট্রানজিস্টর দুটির কালেক্টরের সাথে T_3, T_4 ট্রানজিস্টরের বেসকে জুড়ে দিলে T_3 ও T_4-এর কালেক্টর প্রবাহ কেমন করে পর্যায়ক্রমে বাড়ে ও কমে। যখন T_1-এর কালেক্টর ভোল্টেজ প্রায় শূন্যাবস্থায় যাবে তখন T_3 ট্রানজিস্টরটি ফরোয়ার্ড বায়াস্‌ড হবে এবং T_3-এর কালেক্টর প্রবাহ বাড়বে। এই কারেণ্ট ১নং LED-এর মধ্য দিয়ে প্রবাহের ফলে সেটি জ্বলে উঠবে। এই অবস্থায় T_2 ট্রানজিস্টরটি অফ থাকার ফলে T_4-এর কোন বেস কারেণ্ট থাকবে না এবং T_4-এর কালেক্টর প্রবাহ বন্ধ থাকার ফলে ২ নম্বর LEDটি জ্বলতে পারবে না। অর্থাৎ, সেটি বন্ধ থাকবে। যেহেতু T_1 ও T_2-এর কালেক্টর প্রবাহের অবস্থা স্থির থাকে না, T_1-এর প্রবাহ বন্ধ হয়ে T_2-এর প্রবাহ শুরু হবে। এর ফলে ১ নম্বর LEDটি নিভে যাবে কিন্তু ২ নম্বর LEDটি জ্বলে উঠবে। এই ভাবে ক্রমাগত দুটি LED জ্বলবে ও নিভবে। LED দুটিকে একটি পুতুলের চোখের গর্তে বসিয়ে দিলে মনে হবে যেন পুতুলটি চোখ পিট পিট করছে।
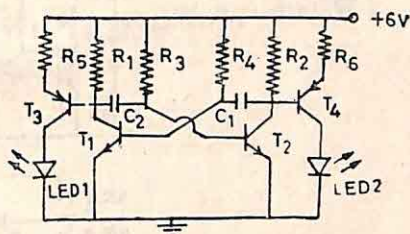
পুতুলের চোখ

প্রয়োজনীয় উপকরণ—

১। ট্রানজিস্টর—T_1, T_2—BC 148, T_3, T_4—AC 188।

২। রেজিস্টর—R_1, R_2—$4{\cdot}7K\frac{1}{2}W$, R_3, R_4—$100K\frac{1}{2}W$, R_5, R_6—$100\Omega\frac{1}{2}W$।

৩। LED—দুটি।

৪। ক্যাপাসিটর—C_1, C_2—50 μF 12V ইলেক্ট্রোলিটিক।

৫। ব্যাটারী, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

২৮নং প্রজেক্ট

ট্রাফিক সিগন্যাল

আমরা আগের সার্কিটটিকে সামান্য একটু পাল্টে নিয়ে একটি ট্রাফিক সিগন্যালের সহজ মডেল তৈরির কায়দা দেখাব। আমাদের জানা আছে শহরের কোন কোন স্থানে একাধিক রাস্তার সংযোগস্থলে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এই সিগন্যালকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যারা ফ্রী রানিং অসিলেটর সার্কিটটি তৈরি করে এটির কার্যকারিতা দেখে নিয়েছেন তাদের পক্ষে বর্তমান সার্কিটটি তৈরি করা এবং এটির কার্যপ্রণালী বুঝতে পারা আদৌ কঠিন হবে না। এবারে দেখা যাক সার্কিটটি কেমন হবে।
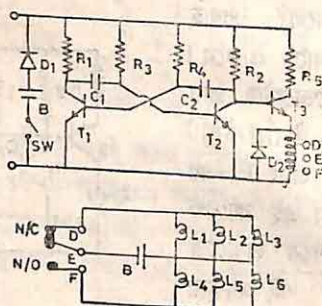
ট্রাফিক সিগন্যাল সার্কিট

বুঝতে অসুবিধে নেই এই সার্কিটের দুটি মূল অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে রয়েছে একটি ফ্রী রানিং অসিলেটর যেটি তৈরি হয়েছে T_1 ও T_2 ট্রানজিস্টর দুটিকে ব্যবহার করে। এর পরের অংশে রয়েছে একটি রিলে সার্কিট যেখানে একটি রিলে পর্যায়ক্রমে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় হয়ে চলেছে। কত ঘন ঘন এই রিলেটি অন বা অফ হবে সেটি নির্ধারিত হবে ফ্রী রানিং অসিলেটরের কম্পাঙ্কের দ্বারা। আগেই দেখেছি কেমন করে এই কম্পাঙ্ককে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

এবারে দেখা যাক রিলেটি অন বা অফ হবার সাথে L_1, L_2, L_3 বা L_4, L_5, L_6 এই বাল্বগুলো কেমন করে নিভবে এবং জ্বলবে। যখন রিলেটি অন হয় তখন D এবং E বিন্দুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে L_1, L_2, L_3 এই বাল্ব তিনটি একসঙ্গে নিভে যাবে। একই সাথে E এবং F বিন্দুর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ফলে L_4, L_5 L_6, এই বাল্ব তিনটি জ্বলে উঠবে। যদি আগের তিনটি বাল্বকে লাল আলোর উৎস ও পরের তিনটি বাল্বকে সবুজ আলোর উৎস হিসেবে কাজে লাগান যায় তাহলে এই আলোর সাহায্যে রাস্তার গাড়ি চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

মনে রাখতে হবে এটি মূলত একটি মডেল হিসেবে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা যায় কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হলে আরও কিছু জটিল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

আমরা ব্যাটারীর সাহায্যে সার্কিটটির সংযোগ দেখালেও এটি এসি মেইনস্ থেকেও চলতে পারবে। সেক্ষেত্রে একটি স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার ও ডায়োড ব্যবহার করে এসি থেকে কম ভোল্টেজের ডিসি করে নিতে হবে। $L_1 - L_6$ এই বাল্বগুলি কম ভোল্টের কিন্তু বেশী কারেণ্টের মত দেখে নিয়ে নির্বাচন করা চাই।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ট্রানজিস্টর T_1, T_2—BC148, T_3—SK100
২। ডায়োড D_1,D_2—BY125।
৩। রেজিস্টর R_1,R_2—$4{\cdot}7K\frac{1}{2}W$, R_3, R_4—$1M\frac{1}{2}W$, R_5—$10\Omega\frac{1}{2}W$।
৪। ক্যাপাসিটর C_1, C_2—$5\mu F$ মাইলার।
৫। 12V রিলে একটি।
৬। 12V বাল্ব ছয়টি।
৬। ব্যাটারী, সুইচ, তার ইত্যাদি।

২৯ নং প্রজেক্ট

পি সি বি (P C B) তৈরি সম্পর্কে দু চার কথা

পিসিবি হচ্ছে প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (Printed Circuit Board) কথাটির সংক্ষিপ্ত নাম। এই কথাটির সাথে আমাদের অনেকেরই পরিচয় রয়েছে। কারও কারও বস্তুটির সাথেও পরিচয় ঘটে থাকবে। যারাই ইলেকট্রনিক্স সার্কিট তৈরি করেছেন তারাও অনেকে এই পিসিবি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন না কেমন করে ঘরে বসেই এই পিসিবি তৈরি করে নেওয়া যায়। একথা ঠিক, পিসিবি বাজার থেকে কিনে নেওয়া যায়। তবে বিশেষ বিশেষ সার্কিটের জন্য এটি তৈরি করে নেওয়া সুবিধাজনক।
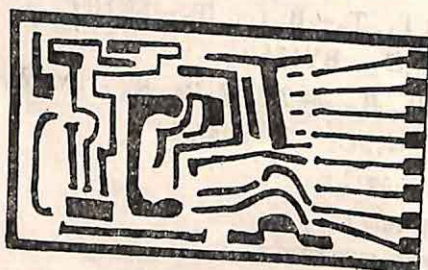
পি সি বি বোর্ড

এবারে দেখা যাক এটি তৈরি করতে গেলে কেমন করে এগুতে হবে। যে সার্কিটটির জন্য আমরা পিসিবি তৈরি করতে চাই সেটিকে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি গ্রাফ কাগজে এঁকে নিতে হবে। এই গ্রাফ কাগজের উপর ছোট ছোট উপকরণগুলোকে বসিয়ে দেখে নিতে হবে পরিকল্পিত সার্কিটটিকে, গ্রাফ কাগজে আঁকা সার্কিট অনুযায়ী সম্পূর্ণ করা যাবে। এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার পরে ঐ কাগজের মাপে এক টুকরো কপার ল্যামিনেটেড বোর্ড জোগাড় করতে হবে। এটি হ'ল—ফাইবার গ্লাস বা ব্যাকেলাইটের উপর তামার পাতলা আস্তরণ যুক্ত একপ্রকার বোর্ড। এইবারে এই বোর্ডের উপর গ্রাফ কাগজে আঁকা সার্কিটটিকে দেখে দেখে এঁকে নিতে হবে। এই আঁকার কাজটি করতে হবে একটি বিশেষ ধরনের কলমের সাহায্যে যেখানে একধরনের প্লাস্টিক কালি ব্যবহার করা হয়। এই কলমটিকে স্কেচ পেন বলা হয়। বেশ পুরু করে সার্কিটটি এঁকে নিয়ে হাওয়ায় শুকিয়ে নেওয়া দরকার। এবারে একটি কলাই করা ট্রে বা থালার মধ্যে কিছুটা পরিমাণ জল নিয়ে তাতে আস্তে আস্তে ফেরিক-ক্লোরাইড নামক একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ঢেলে একটি দ্রবণ তৈরি করতে হবে। এই দ্রবণটি তৈরি করে তার মধ্যে ল্যামিনেটেড বোর্ডের টুকরাটি ডুবিয়ে দিতে হবে। এবার আস্তে আস্তে ট্রেটিকে নাড়তে থাকুন। নজর করে দেখুন পেনের কালি দিয়ে ঢাকা অংশের বাইরে তামার যে আস্তরণ রয়েছে সেটি
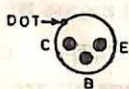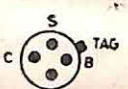
আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যাচ্ছে কিনা। যদি ক্ষয়ে যাবার কোন লক্ষণ না দেখা যায় তাহলে আরও কিছুটা ফেরিকক্লোরাইড ঐ দ্রবণে মিশিয়ে একটু গাঢ় করে নিন। এবারে আগের মত নাড়তে থাকুন। বেশ কিছুটা সময় বাদে বোর্ডের উপর অনাবৃত তামার আস্তরণটি সম্পূর্ণ ক্ষয়ে যাবে এবং ঐ ক্ষয়ে যাওয়া অংশে গ্লাস ফাইবার বা ব্যাকেলাইট দেখতে পাওয়া যাবে। ক্ষয়ে যাওয়ার কাজটি সম্পূর্ণ হলে বোর্ডটিকে দ্রবণ থেকে তুলে নিন এবং পরিস্কার জলে ধুয়ে ফেলুন। দেখতে পাবেন রং লাগান জায়গায় রংটি আগের মতই রয়ে গেছে। আসলে এই রঙের নিচে তামার আস্তরণকে ফেরিকক্লোরাইডের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এই বিশেষ ধরনের রঙের কলমটি ব্যবহার করা হয়েছিল। এবারে আমাদের কাজ হ'ল এই রঙটিকে মুছে ফেলে আবৃত তামার আস্তরণের লাইনগুলো মুক্ত করা। এই মুছে ফেলার কাজটি করার জন্য আমরা ব্যবহার করব অ্যাসিটোন নামক আর একটি রাসায়নিক দ্রবণকে। মনে রাখতে হবে এটিকে আগুন থেকে দূরে রেখে ব্যবহার করা দরকার। একটি কাপড়ের টুকরাকে এই অ্যাসিটোনে ভিজিয়ে রঙের দাগগুলোকে ঘসলেই সেগুলো মুছে যাবে। এবারে সার্ফের গুড়ো বা ঐ জাতীয় কোন কিছু দিয়ে বোর্ডটিকে ভাল করে ধুয়ে তুললেই আমাদের কাজ শেষ অর্থাৎ পিসিবি তৈরি। এবারে এই পিসিবির উপর মাপমতো ফুটো করে উপকরণগুলো বসিয়ে নিয়ে ঝালতে পারলেই সার্কিট তৈরি। এই পিসিবি তৈরির সময় দু'একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। ফেরিকক্লোরাইডের গুড়ো বা তার দ্রবণ জামা কাপড় নষ্ট করে। অ্যাসিটোন আগুনের সংস্পর্শে এলে জ্বলে উঠবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। কপার ল্যামিনেটেড বোর্ড।
২। স্কেচ পেন।
৩। ফেরিকক্লোরাইড।
৪। অ্যাসিটোন।
৫। ট্রে, গ্রাফ কাগজ, কাপড়ের টুকরা ইত্যাদি।

কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত ট্রানজিস্টরের প্যাকেজ

Transistors	Package
AC125, AC126, AC127, AC128, A132 AC172, AC187, AC188	DOT, C, E, B — TO-1 PACKAGE
2N2218. 2N2218A, 2N2219, 2N2219A. 2N2904, 2N2904A, 2N2905. 2N2905A.	TAG, E, B, C — TO-5 PACKAGE
2N2221, 2N2222A, 2N2222, 2N2222A, 2N2906, 2N2907, BSX19, BSX20, BC177, BC178, BC179, BC107, BC108, BC109, SL100, SK100.	C, TAG, E, B — TO-18 PACKAGE
BFW10, BFW11, BF115, BF167, BF173, BF181, BF184, BF200.	S, TAG, C, B, E — TO-72 PACKAGE S-SHIELD
BC147, BC148, BC149, BC157, BC158.	C, E, B — PLASTIC PACKAGE
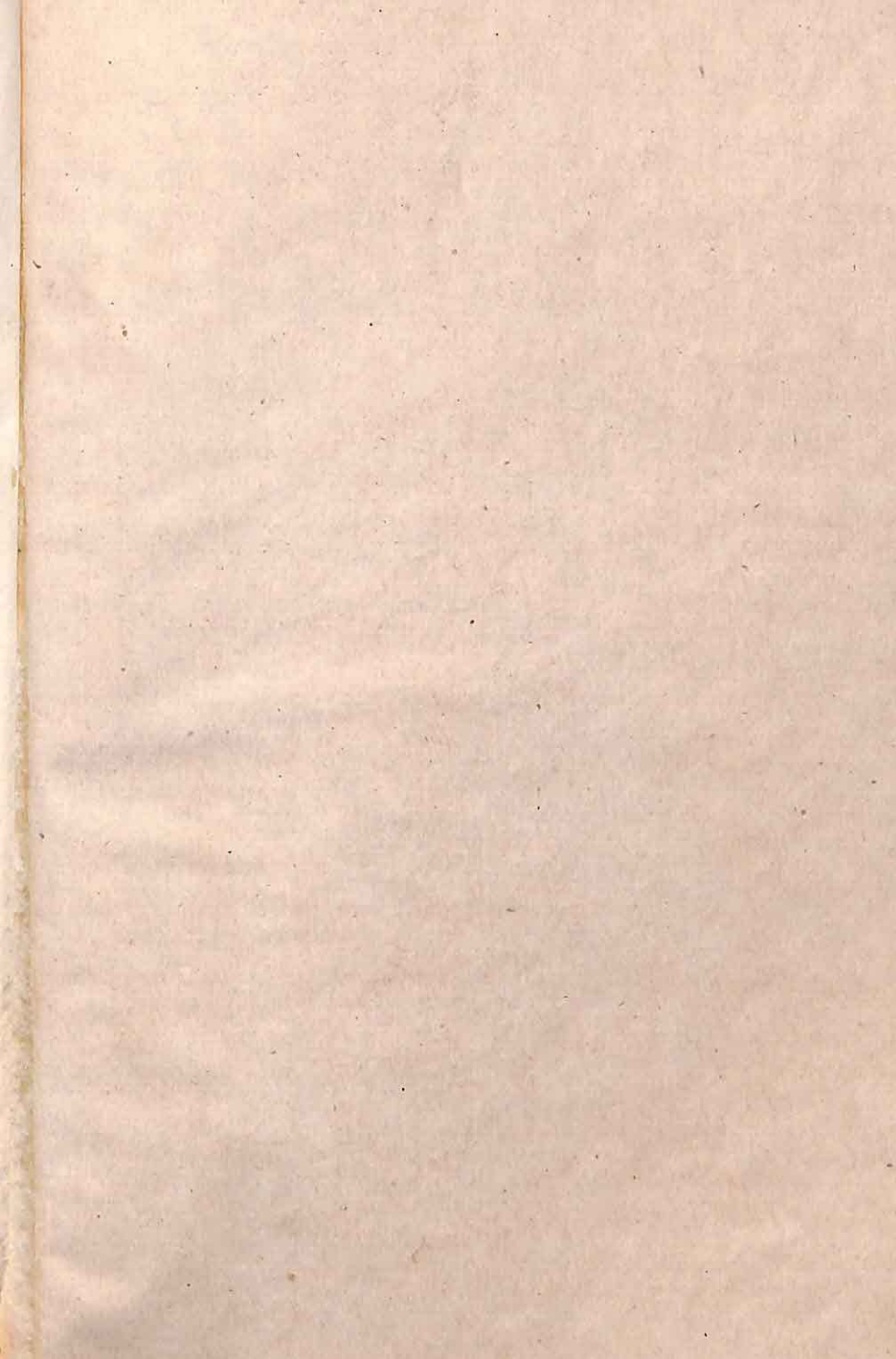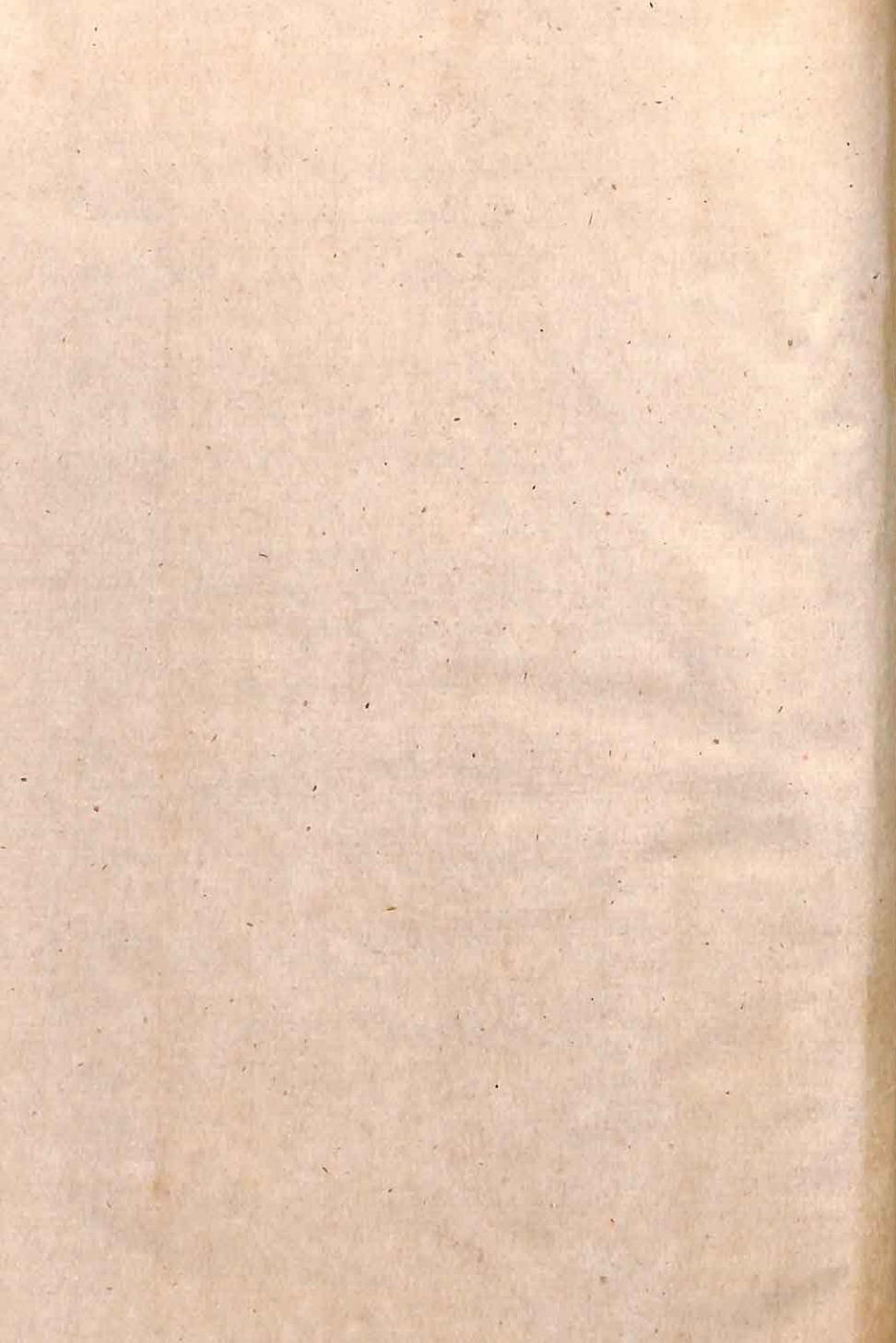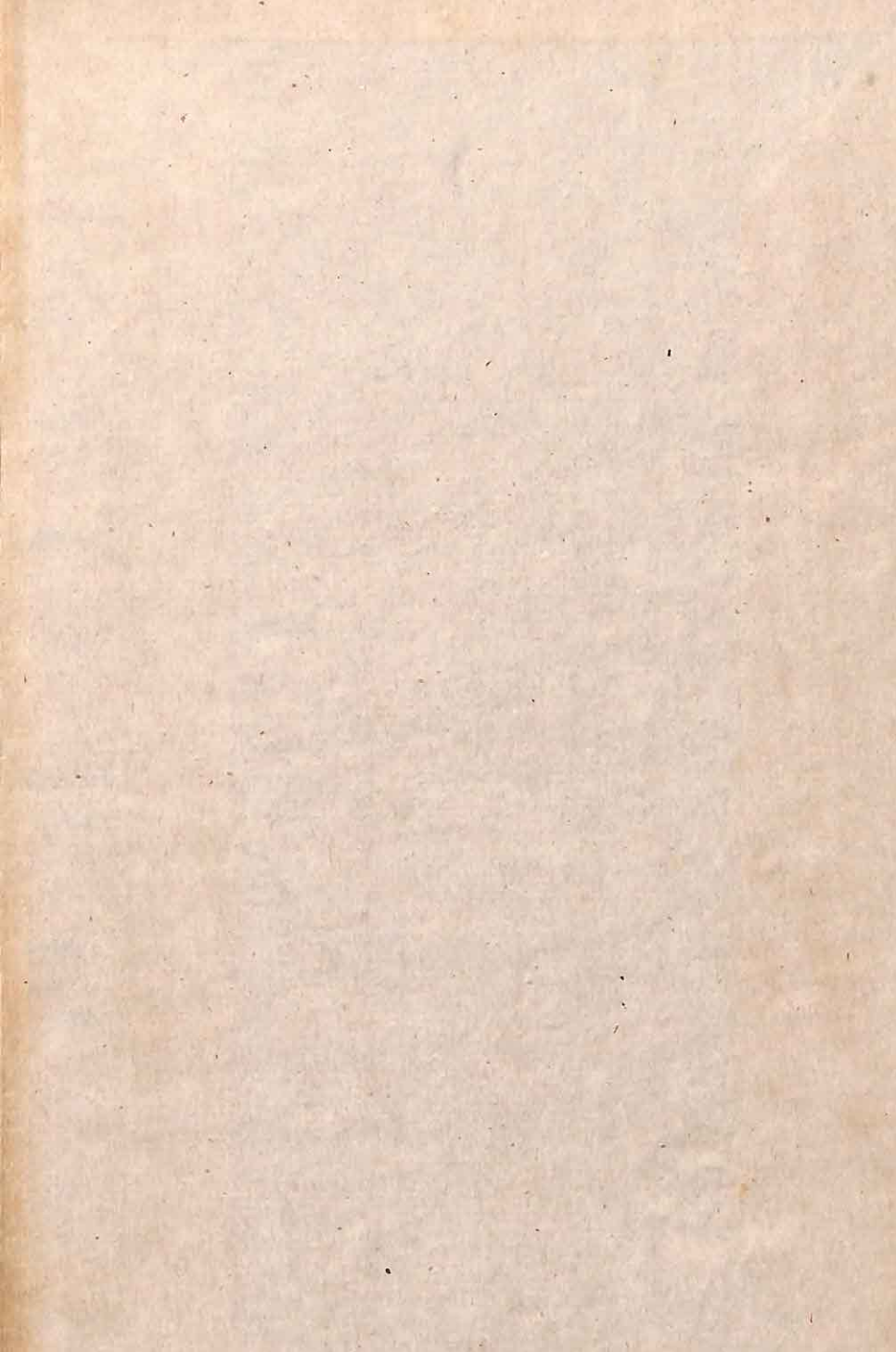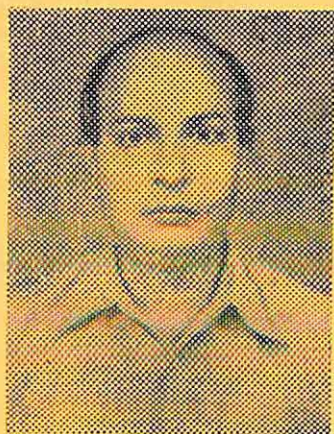
জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাহিত্যের আসরে রত্নেশ্বর রায় একটি নতুন নাম।
কিন্তু তাঁর প্রথম বই 'হাতেকলমে ইলেকট্রনিক্স,
প্রমাণ করে দেবে ইলেকট্রনিক্স ও জনপ্রিয়চর্চায় তাঁর
অভিজ্ঞতা মোটেই নতুন নয়। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', 'ফোটন' ইত্যাদি
পত্রিকায় তাঁর বিজ্ঞান নিবন্ধ সমাদৃত হয়েছে।
আর ইলেকট্রনিক্স প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রজীবন থেকেই
তাঁর কাছে প্রিয়। সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় বি· এস· সি· ডিগ্রি লাভের
পর ফলিত পদার্থবিদ্যায় এম· টেক করে
বর্তমানে ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ সিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার
পদে প্রতিষ্ঠিত। পড়াশোনা গবেষণার এই সুদীর্ঘ পথে
ইলেকট্রনিক্স তাঁর কাছে প্রথম ভালবাসা হয়ে উঠেছে। সেই
প্রিয় বিষয়ের নানান আশ্চর্য দিক ও কারিগরী নিয়ে অনেক যত্নে
লেখক গড়ে তুলেছেন 'হাতেকলমে ইলেকট্রনিক্স ; এই বই
আগ্রহী পাঠকের কাছে শুধু এক
আশ্চর্য উপহারই নয়, হাতেকলমে ইলেকট্রনিক্স শিখে
নিজেকে গড়ে তোলারও বই।